তথ্য কণিকা ২০২৬

বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ

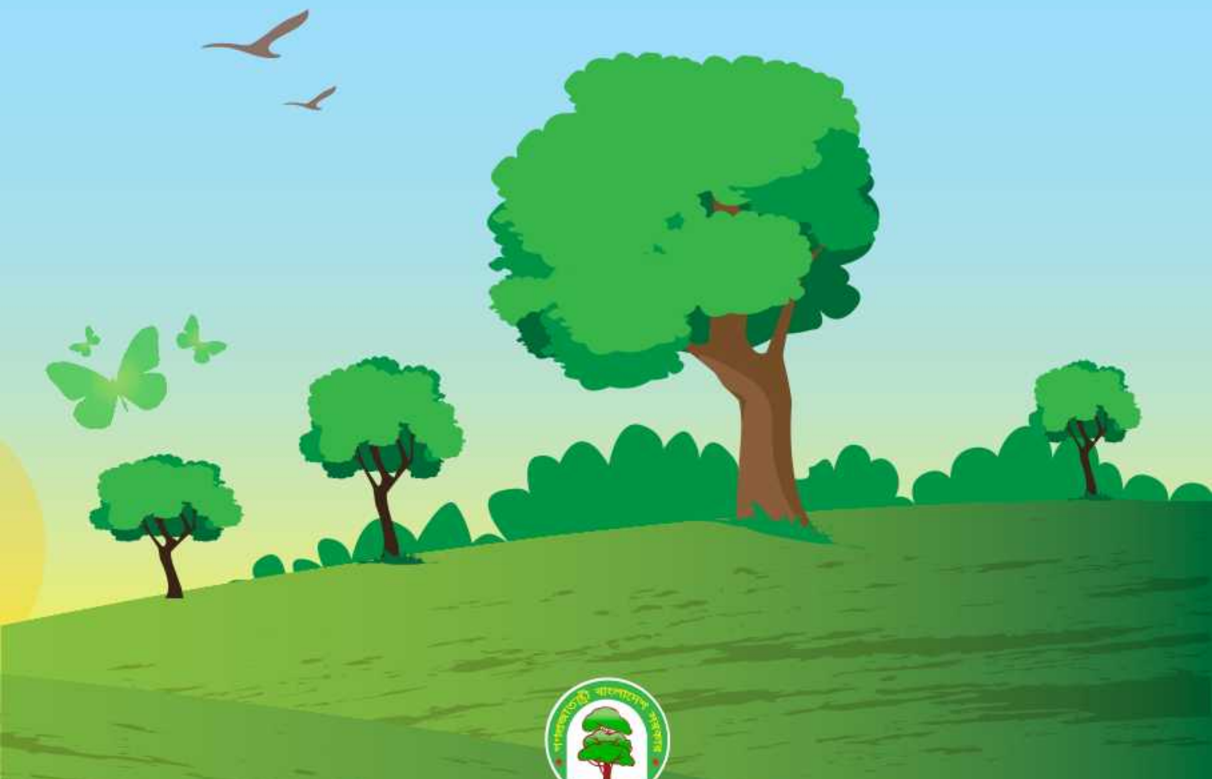

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের বন আচ্ছাদন মানচিত্র ২০২৩

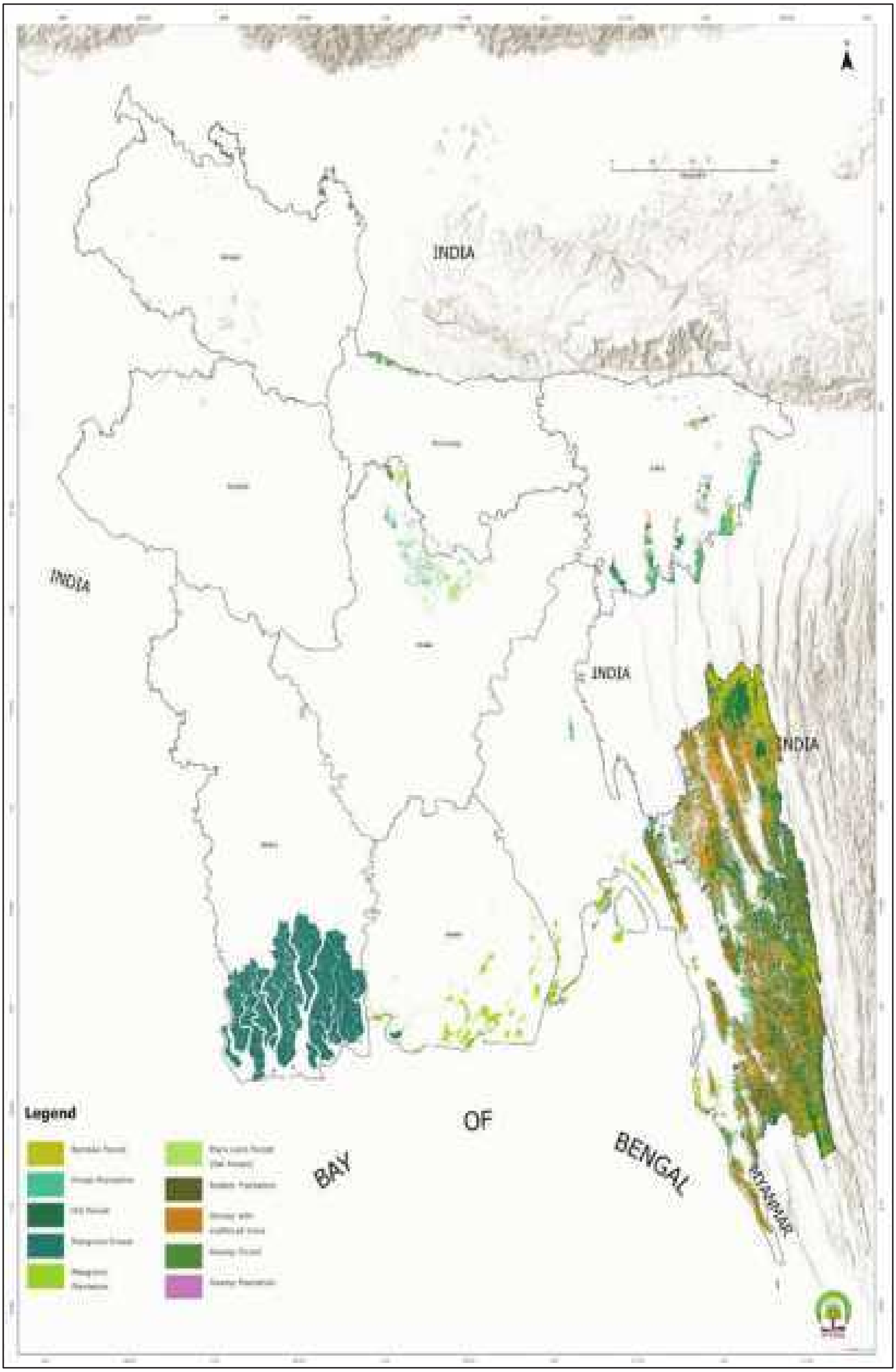

সূচিপত্র

বাংলাদেশের বন	০৪
পাহাড়ি বন	০৪
শাল বন	০৪
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	০৫
জলাভূমির বন	০৫
সৃজিত উপকূলীয় বন	০৬
উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য	০৭
৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	০৭
অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা	০৮
সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা	০৯
সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন	১১
বন অধিদপ্তরের নার্সারি	১১
বন অধিদপ্তরের সেবা	১১
বন অধিদপ্তরের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহের তালিকা	১২
জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান	১৪
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া	১৫
সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া	১৬
জীববৈচিত্র্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা	১৭
ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার	১৮
গাজীপুর সাফারি পার্ক, গাজীপুর	২০
অন্যান্য এলাকা ভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)	২১
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য	২২
বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট, ২০১৫	২২
বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রম (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)	২৩
বাংলাদেশের উদ্ভিদকুলের রেড লিস্ট	২৫
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ	২৬
হাতি সংরক্ষণ	২৬
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ ও জরিপ ২০২৪	২৮

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নতুন মাইলফলক: সুন্দরবনের গুরুতর আহত বাঘিনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ	২৮
কুমির সংরক্ষণ	২৯
মাস্কড ফিনফুট সংরক্ষণ	৩০
ডলফিন সংরক্ষণ	৩০
ঘড়িয়াল সংরক্ষণ	৩২
বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট	৩৩
ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব	৩৬
বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	৩৭
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিধিমালা এবং নীতিমালা	৩৮
Flyway Site Network সম্পর্কিত তথ্য	৩৯
বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন	৪২
জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	৪৪
বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৪৫
বন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	৪৬
ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র	৪৭
বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা/পুনরুদ্ধার	৪৯
বন অধিদপ্তরের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম	৫০
বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার	৫২
জাতীয় পুরস্কার	৫২
আন্তর্জাতিক পুরস্কার	৫৩
বন অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ	৫৩
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস	৫৪
বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৫৪
বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য	৫৫
বন অধিদপ্তরের বিগত ০৩ (তিন) বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	৫৫

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বনভূমিতে বন আচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১২.১%। বাংলাদেশের বনভূমি এবং বনের বাহিরের সকল ভূমির বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২৪.৪০%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন: পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

পাহাড়ি বন

অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা।

পাহাড়ি বন

পরিমাণ: উল্লিখিত জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ি বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% এবং বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৩%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশূকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

শাল বন

অবস্থান: গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। এছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে।

শাল বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ০.৮১% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৭%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের মূল প্রজাতি শাল *(Shorea robusta)*, যা অনেকেই গজারি বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এছাড়া এই বনে হরিতকী, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবিড়াল, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান: পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এই বন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ৪.০৭% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা ও মায়া হরিণ, বানর, শূকর, কুমির, অজগরসহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, গুইসাপ, মেছোবিড়াল, সজারু, ভোঁদড়, বনমোরগ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ইত্যাদি।

নদী/খাল: এ বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

মৎস্য সম্পদ: শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। এ বনে ইলিশ, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্য: সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জলাভূমির বন

অবস্থান: সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওর ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত।

রাতারগুল জলাভূমির বন, সিলেট

পরিমাণ: রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ০.০১%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে।

বন্যপ্রাণী: বানর, মেছোবিড়াল, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালি, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজিত উপকূলীয় বন

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।

সৃজিত উপকূলীয় বনের ড্রোন চিত্র, ভোলা

সৃজিত উপকূলীয় বন, পটুয়াখালী

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৭৫ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের ১.৮৫ %।

উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, গেওয়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দল, পশুর, সুন্দরী, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবিড়াল, কুমির, শূকর, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভাণ্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, লইট্যা, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৩ একর (২,৭৩,৭৭৫ হেক্টর) বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে। উপকূলীয় বনাঞ্চল মাছ, কাঁকড়া ও চিংড়ির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এটি বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসহ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল।
- উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলীয় এলাকার ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর ভূমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে উপকূলীয় অঞ্চলে ৭ হাজার ৭ শত ৮৪ একর (৩১৫০ হেক্টর) ম্যানগ্রোভ বাগান ও ৫০ কিলোমিটার গোলপাতা বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬০০টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

"২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি" সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ৫ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বৃক্ষরোপণকে শুধু গতানুগতিক কর্মসূচির মধ্যে না রেখে বরং জনগণের অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রজন্মগত উন্নয়নের এক সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৩.৫ লক্ষাধিক সবুজ কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যেখানে নারী, যুবক-যুবতী ও গ্রামীণ জনগণ সমানভাবে অংশ নেবে। একই সঙ্গে ১০,০০০ নতুন নার্সারি উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হবে, যা ২.৫ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি করবে। বৃক্ষরোপণের এ কর্মসূচি গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় উপদেষ্টা জনাব নজরুল ইসলাম খান-কে আহ্বায়ক করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় সরকারের প্রথম বছরে ৫ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তর ৩.৫ কোটি বৃক্ষরোপণ করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনাঞ্চল বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৩ জুন ২০২৬ তারিখ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকার সংরক্ষিত বনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে একযোগে ৬৪ জেলায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষেরোপণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

সামাজিক বনায়ন

"সামাজিক বনায়ন" অর্থ Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section 28A এর sub-section (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সৃজনকৃত উডলট বা ব্লক, স্ট্রিপ বনায়ন, যা স্থানীয় অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বন অধিদপ্তর Forest Act, ১৯২৭ এর section 28A(১) এর বিধান অনুসারে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে কেবল অবক্ষয়িত বন এলাকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বন অধিদপ্তর ১৯৬০-এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি ভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে, যা পরবর্তীতে ২০১০ ও ২০১১ সালে সংশোধিত হয় এবং ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ সালে "সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬" প্রণয়ন করা হয়। এই বিধিমালায় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষ কর্তনের পরিবর্তে বৃক্ষ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে সামাজিক বনায়নে রোপিত গাছ কর্তন করে অংশীজনের মধ্যে অর্থ বিতরণের পরিবর্তে পৃথক ব্যবস্থাপনায় শ্রমের মূল্য ও রোপিত বাগানে বাগান কেন্দ্রিক সুবিধা প্রদান করা হবে এবং সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারবে: তবে শর্ত থাকে যে, কাঠের চাহিদা পূরণের অত্যাবশ্যকতা বিবেচনায় অথবা অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে স্ট্রিপ, উডলট বা ব্লক বাগানের গাছ কর্তনের প্রয়োজন হলে বন বিভাগ এতদবিষয়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনক্রমে গাছ কর্তনপূর্বক বিধি ১৩ অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে পারবে।

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম

আবর্তকাল ও স্থানীয় অংশীজন নির্বাচন

"আবর্তকাল (Rotation)" অর্থ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে গাছ রোপণ থেকে অপসারণ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কাল যা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে এবং যা বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

সামাজিক বনায়নের জন্য নির্ধারিত ভূমির এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে (ক) ভূমিহীন বা ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক (খ) বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা বা দুঃস্থ নারী (গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুঃস্থ সদস্য (ঘ) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং (ঙ) অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর অধিবাসী স্থানীয় অংশীজন হিসেবে নির্বাচিত হবে। স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারী নির্বাচন করতে হবে। ব্লক বাগানের ক্ষেত্রে ১ (এক) জন স্থানীয় অংশীজন সর্বোচ্চ ১ (এক) একরের জন্য এবং স্ট্রিপ বনায়নের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারের (প্রতি ১ হাজার রোপিত চারা) জন্য সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) জন স্থানীয় অংশীজন নিয়োগ করতে হবে। সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন (১) বিধি ১২ এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে ছাঁটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ (First Thinning) কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় অংশীজন প্রাপ্য হবেন। পরবর্তী সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণ এবং কাঠের চাহিদা পূরণে গৃহীত সামাজিক বনায়নের গাছ কর্তনের ক্ষেত্রে এবং অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে কর্তৃত বৃক্ষ হতে লব্ধ আয় চুক্তিভুক্ত অংশীজনের মধ্যে চুক্তিনামা (PBSA) অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৭৬.১৬ হেক্টর ব্লক/ উডলট এবং ৮২ হাজার ৮৩০.১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৭ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন; তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৮৮ জন।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে মোট ৫৮ হাজার ৪০৯ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৪৪ হাজার ৯০৬.৭৮ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ২৫৫৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা।
- এ যাবৎ ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৬৬ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৫৩৬ কোটি ৭২ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩৭ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃ বনায়নের কাজে বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৭৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৭ টাকা জমা করা হয়েছে।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এ যাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৮৪৯ কোটি ৪১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২২ টাকা।
- ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্যদের মাঝে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২৮১ কোটি ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ২৮০ টাকা।

সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বন অধিদপ্তর নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুসহ ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি সফল অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এ কারণে পূর্বে যারা বন থেকে অবৈধভাবে সম্পদ আহরণের সুযোগ খুঁজতো তারাই এখন বনকর্মীদের সাথে বনজসম্পদ রক্ষা করছেন। রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে, ফলে বনে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। Grant Financing এর আওতায় রক্ষিত এলাকায় পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের ৫০%

ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে। রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বন অপরাধ ও বনজসম্পদের পাচার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যার সঠিক বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়েল (COM) অনুসরণে ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুফল প্রকল্প বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের মাধ্যমে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ৭টি এনজিও কর্তৃক মাঠপর্যায়ে ৬১৫টি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৬৮ টি ফরেস্ট কনজারভেশন ভিলেজ (FCV) ও ১৪৭টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম রয়েছে (VCF)। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিটিতে ৫টি করে গ্রাম পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে ৩০৭৫টি সাব-কমিটি (ক. বন রক্ষা ও সংরক্ষণ কমিটি, খ. অর্থ ও হিসাব কমিটি, গ. গ্রামীণ ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি, ঘ. ক্রয় কমিটি, ঙ. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি) গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সর্বমোট ৪৬% নারী সদস্য রয়েছে। পাশাপাশি, সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন, বেইজলাইন সার্ভে, পরিচালনা কমিটি ও ৬১৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

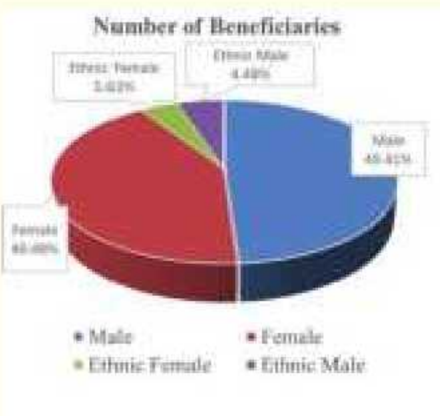

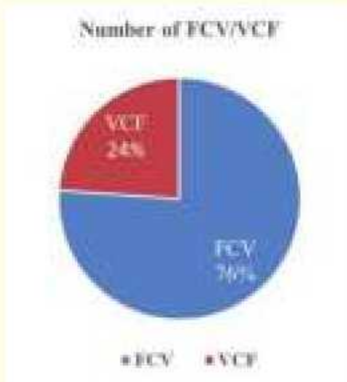

মোট ৪১,০০০ সুবিধাভোগীদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪০,২৬৪ জন সুবিধাভোগীকে ১৬,৫৪৫.১৫ লক্ষ টাকা (বুক কিপারসহ) জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ঋণ এবং কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ১৯৭১টি উপপ্রকল্প যেমন: গ্রামীণ ইট-সলিং রাস্তা, কালভার্ট, স্কুলের জন্য শৌচাগার, বাউন্ডারি ওয়াল, বাঁশের সেতু, কাঠের সেতু, সোলার ল্যাম্পপোস্ট নির্মাণসহ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করবার জন্য ২৫১৩.০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২৭,৬৭৫ জন কমিউনিটি সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং ৪১,০০০ জন সদস্যকে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১১০৭০ জনকে বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সদস্যগণ ইতোমধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিকল্প জীবিকা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। ১,২৩০ জন কমিউনিটি সদস্যকে সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা (Social and Environmental Safeguards) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬ অনুযায়ী দুস্থ, অনগ্রসর নারীরা উপকারভোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ন্যূনতম দুইজন নারী থাকেন। "রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭" অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬১৫টি এফসিভি/ভিসিএফ এ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় নারী

বন অধিদপ্তরের নার্সারি

বন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ৯৮টি এস.এফ.এন.টি.সি (সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এবং ৩৪১টি উপজেলায় এস.এফ.পি.সি (উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র) রয়েছে। বন বিভাগে বিদ্যমান এই ৪৩৯টি নার্সারিতে বিভিন্ন বনজ, ফলদ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন করতঃ সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০০২ সাল হতে ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সাল পর্যন্ত বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারিতে ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ ২ হাজার ৩৬৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের সেবা

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেনস চার্টার হলো নাগরিক এবং সেবাদাতার মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করে, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করে ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ অনুযায়ী বন অধিদপ্তরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং হালনাগাদ করা হয়। সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভা/সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। বন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সেবাসমূহ তাদের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। এছাড়াও বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ সকল সেবা লিংক আকারে দেয়া আছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ প্রশাসনের দপ্তরসমূহ কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়াও বন অধিদপ্তর অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জনগণ Citizen's Charter এ প্রদত্ত কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেলে কিংবা যেকোন কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে GRS এ অভিযোগ করতে পারেন। অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগটি বন অধিদপ্তরের অনিক (অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা) সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করে তদন্ত করত সত্যতা যাচাইপূর্বক নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অভিযোগকারী অনিকের তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে মন্ত্রণালয়ের আপিল কর্মকর্তা বরাবর আপিল করতে পারেন। GRS Platform এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ তাদের অভিযোগ ও আবেদন দাখিল করছে এবং কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে। GRS Platform শুধু সাধারণ জনগণের জন্যই নয় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যও এটি উন্মুক্ত।

হেল্পলাইন নম্বর ৩৩৩-৪ এর মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং অভিযোগ গ্রহণ

দেশের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণে অপারগ জনসাধারণের সুবিধার্থে বন অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং নাগরিকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় কল সেন্টারে টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর নির্ধারণ করা হয় ৩৩৩-৪। রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক জাতীয় হেল্পলাইন নম্বরে কল দিয়ে এজেন্টদের সাথে সরাসরি কথা বলে বন, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানতে পারেন এবং অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। প্রাপ্ত অভিযোগসমুহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আইডি হতে তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয় এবং প্রধান কার্যালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

বন অধিদপ্তরের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহের তালিকা

জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৫৭ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ২৭ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ১৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ৪ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ৪ টি ইকোপার্ক এবং ২ টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ২ টি শকুন নিরাপদ এলাকা (Vulture Safe Zone) ঘোষণা করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) পরিমাণ ৮,১৮,৯২১.৮৩৬ হেক্টর। এর মধ্যে Terrestrial রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪,৭০,৮২২.৮৩৬ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ৩.১৯ শতাংশ।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ

১. রেমাকালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২. ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩. হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৪. চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৫. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৬. পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৭. সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৮. টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৯. সোনার চর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১০. চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

১১. টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১২. সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৩. সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৪. সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৫. চাঁদপাই বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৬. দুধমুখী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৭. ঢাংমারী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৮. নগরবাড়ী- মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য
১৯. শিলন্দা নাগডেমরা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২০. নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২১. পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২২. শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৩. ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৪. পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২৫. বাইশারী ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২৬. জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য (বিলজোয়ানিয়া)
২৭. জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য (বিলভালা)

রক্ষিত এলাকাগুলোর অবস্থান দেখিয়ে একটি মানচিত্র

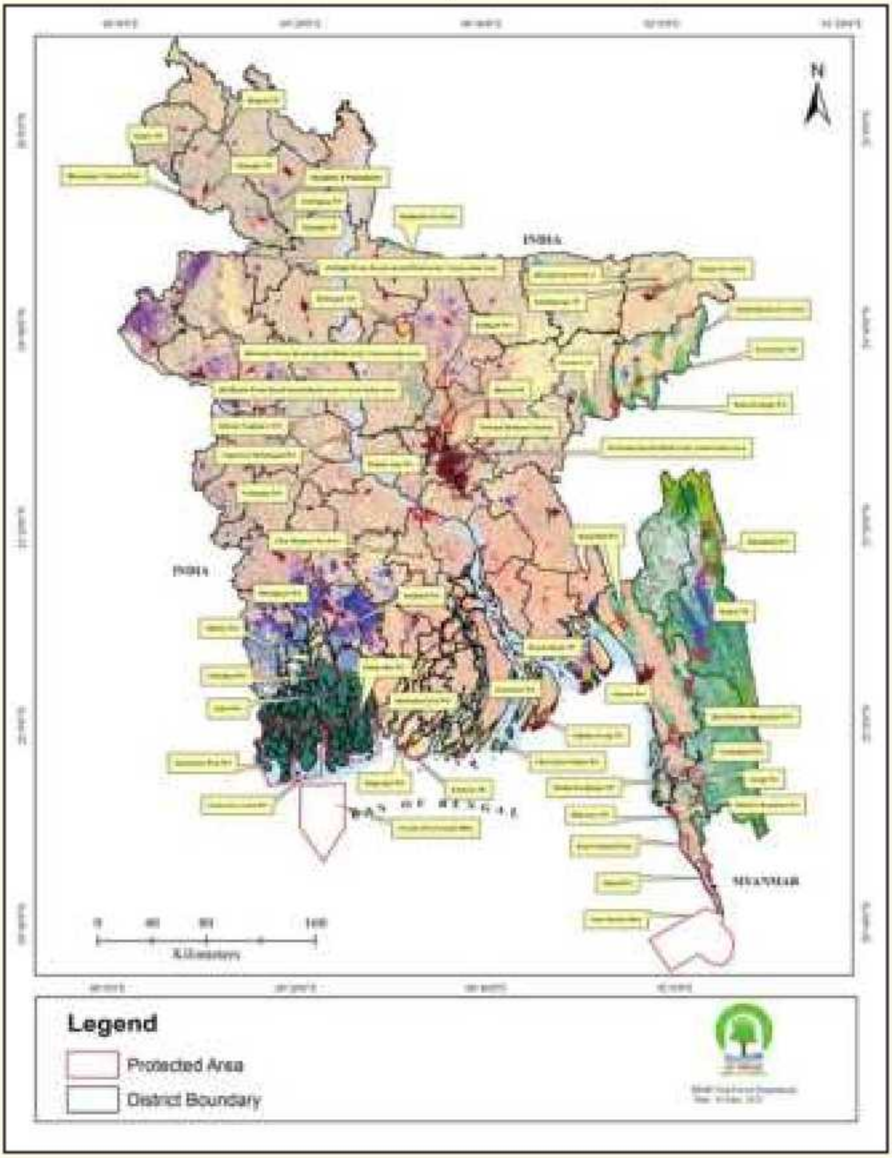

জাতীয় উদ্যান:

১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
৭. নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান
৮. মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
১০. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান
১১. বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান
১২. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান
১৩. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৪. সিংড়া জাতীয় উদ্যান
১৫. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান
১৬. আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৮. ইনানী জাতীয় উদ্যান
১৯. ধর্মপুর জাতীয় উদ্যান

ইকোপার্ক:

১. চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
২. টিলাগড় ইকোপার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক
৪. মধুটিলা ইকোপার্ক

উদ্ভিদ উদ্যান:

১. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা:

১. রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
২. আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
৩. ভাড়ারদহ ও পাটোয়াকামড়ি বিল
৪. পূর্বাচল বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া:

১. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া
২. সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও একমাত্র জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিবেশ শিক্ষা ও প্রকৃতিভিত্তিক বিনোদন কেন্দ্র। ১৯৬১-১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যানটি প্রায় ২১৫.২২ একর (৮৭.১৩ হেক্টর) এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এটি দেশের দেশীয় ও বিদেশি উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ, গবেষণা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই উদ্যান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূল্যবান উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ, বিদেশি উদ্ভিদের পরিচিতি ও অভিযোজন, উদ্ভিদবিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ মানুষের জন্য একটি জীবন্ত প্রকৃতি শিক্ষাগার গড়ে তোলা। বর্তমানে এটি একটি জীবন্ত উদ্ভিদ জাদুঘর (Living Museum) হিসেবে পরিচিত, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে হাজার হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষিত রয়েছে।

উদ্যানটি ৫৭টি সেকশন ও ১৩টি জোনে বিভক্ত। প্রতিটি সেকশনে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে গোলাপ বাগান, পাম বাগান, বাঁশ বাগান, ঔষধি উদ্ভিদ বাগান, ক্যাকটাস সংগ্রহশালা, অর্কিড হাউস, ফার্ন হাউস, প্রজাপতি বাগান, জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহশালা, মৌসুমি ফুলের বাগান এবং বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সমারোহ একসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন।

উদ্যানের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে মনোরম গোলাপ বাগান, যেখানে শতাধিক জাতের গোলাপের সমাহার; বিশালাকার ভিক্টোরিয়া ওয়াটার লিলি বা বৃহৎ শাপলা সংগ্রহ; সুদৃশ্য পাম অ্যাভিনিউ; কৃত্রিম লেক ও জলাশয়; সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তর; বাঁশের সমৃদ্ধ সংগ্রহ; এবং দেশি-বিদেশি ফুল, গুল্ম ও বৃক্ষের সুবিন্যস্ত প্রদর্শনী। সম্প্রতি এই উদ্যানে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ধরনের খালি পায়ে হাঁটার রাস্তা যেটা সর্বদা প্রকৃতিপ্রিয় মানুষের কলরবে মুখরিত থাকে।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে বর্তমানে প্রায় ৮০,০০০টি উদ্ভিদ সংরক্ষিত রয়েছে, যা ১৪৩টি পরিবার (Family), ৫৯৫টি গণ (Genus) এবং ১,০৪২টি প্রজাতি (Species)-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। এর মধ্যে ৫১৩টি দেশীয় (Indigenous) এবং ৫২৯টি বিদেশি (Exotic) প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। কাঠজাতীয় বৃক্ষ, শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ, পাম, বাঁশ, ক্যাকটাস, অর্কিড, ঔষধি উদ্ভিদ, জলজ উদ্ভিদ এবং বিরল ও বিপন্ন উদ্ভিদের সমৃদ্ধ সংগ্রহ এ উদ্যানকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সংরক্ষণাগারে পরিণত করেছে।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এই উদ্যান ঢাকা মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল। এখানে ১৯০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি (আবাসিক ও পরিযায়ী) দেখা যায়। এছাড়া শিয়াল, বনবিড়াল, বেজি, বাদুড়, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর উপস্থিতি উদ্যানটির জীববৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান কেবলমাত্র বিনোদনের স্থান নয়; এটি দেশের উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এখানে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস, সংরক্ষণ জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্যানতত্ত্ব, পরিবেশবিদ্যা ও উদ্ভিদসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা সফর ও ব্যবহারিক পাঠের জন্য এ উদ্যান পরিদর্শন করে।

দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে উদ্যানে রয়েছে প্রশস্ত সড়ক, হাঁটার পথ, বিশ্রামাগার, পাবলিক টয়লেট, মসজিদ, ক্যাফেটেরিয়া, নার্সারি, শিশু পার্ক, পর্যবেক্ষণ ডেক, বসার স্থান এবং দিকনির্দেশনামূলক তথ্যফলক। উদ্যানের প্রতিটি অংশ পরিকল্পিতভাবে সাজানো রয়েছে যাতে দর্শনার্থীরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি উদ্ভিদ সম্পর্কে সহজেই জানতে পারেন। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় এটিকে সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে উদ্যানের মূল্যবান উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণীর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এর একটি স্যাটেলাইট ইউনিট রয়েছে যেটা ঢাকার ওয়ারিতে অবস্থিত এবং বলধা গার্ডেন নামে সুপরিচিত। কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বিবেচনায় সরকার ২০২৫ সালে বলধা গার্ডেনকে কুঞ্জবন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে।

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড (Swatch of No Ground) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ গভীর সমুদ্রাঞ্চল। এটি বঙ্গোপসাগরের উত্তরাঞ্চলের একটি অনন্য সাবমেরিন ক্যানিয়ন (Submarine Canyon), যা ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, গভীরতা এবং সামুদ্রিক প্রাণিবৈচিত্র্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলটি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী, তিমি, ডলফিন, হাঙ্গর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্র।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) ও ১৩ (২) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো- গ্রাউন্ড এলাকার ১,৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে "সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া (SoNG-MPA)" হিসেবে ঘোষণা করে। এটি বাংলাদেশের প্রথম বহু-ব্যবহার্য গভীর সমুদ্রভিত্তিক রক্ষিত এলাকা, যা দেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ রক্ষিত এলাকা ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য দেশের বিপন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল, বিচরণ এলাকা এবং প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা।

এই এলাকায় ৯ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিনসমূহ যেমন: ইরাবতী ডলফিন, পাখনাহীন পরপয়েস, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘূর্ণি ডলফিন, খর্বদাঁতী ডলফিন, ছদ্ম ঘাতক তিমি, ও ঘাতক তিমির উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে ব্রিডিস তিমির মতো বিরল জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যায়। বামন স্পার্ম তিমি, কমন স্পার্ম তিমি ও নীল তিমির মতো প্রজাতিও এ অঞ্চলে বিচরণ করে বলে ধারণা করা হয়। হাঙর ও শাপলাপাতা মাছের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল কমপক্ষে

১১ প্রজাতির হাঙর এবং ৪৮ প্রজাতির শাপলাপাতা মাছের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, যার অধিকাংশই বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন। বিশ্বের সাত প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিম প্রজাতির (Sea turtles) মধ্যে তিনটি প্রজাতি, জলপাইরঙা সাগর কাছিম, সবুজ সাগর কাছিম ও ঈগলঠুঁটি সাগর কাছিম এখানে পাওয়া যায়। এছাড়াও এই এলাকা বিভিন্ন সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পাখির (seabirds and Shorebird) গুরুত্বপূর্ণ বিচরণ ও খাদ্যসংগ্রহ এলাকা, যেখানে গাল (gulls), টার্ন (terns), গ্যানেট (gannets), শিয়ারওয়াটার (shearwaters), ফ্রিগেটবার্ড (frigatebirds)-সহ বিভিন্ন পেলাজিক পাখি নিয়মিতভাবে দেখা যায়। গভীর সমুদ্রের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের মধ্যে টুনা, ম্যাকারেল, গ্রুপার, স্ন্যাপারসহ বিভিন্ন পেলাজিক ও ডেমারসাল মাছের প্রাচুর্য দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি সামুদ্রিক সাপ (sea snakes) এ অঞ্চলের খাদ্যশৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ছোট মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে; ফলে কচ্ছপ, মাছ, সাপসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সম্মিলিতভাবে এ অঞ্চলের জটিল খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার কার্যকর সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে Integrated Management Plan for the Swatch of No Ground Marine Protected Area (২০২৪-২০৩৩) অনুমোদন করে।

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড

বোতলনাক ডলফিন

চিত্রা ডলফিন

জলপাইরঙা সাগর কাছিম

সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা, যা দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত টেকনাফ পেনিনসুলা এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক জলসীমা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলে অবস্থিত। বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন প্রবাল, গোলাপি ডলফিন, বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর ও রে মাছ, সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক পাখি, সামুদ্রিক ঘাসসহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর ধারা ১৩(১) ও ১৩(২)-এর ক্ষমতাবলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন

মন্ত্রণালয় ০৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ১,৭৪৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে "সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করে। এ মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার গভীরতা ৭০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, যা বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর প্রজনন, বিচরণ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ প্রদান করে। উল্লেখ্য, এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৫৯০ হেক্টর এলাকাকে ইতঃপূর্বেই ২০ মে ১৯৯৯ তারিখে গেজেটের মাধ্যমে "সেন্টমার্টিন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" (Ecologically Critical Area-ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার কিছু কোরাল

জীববৈচিত্র্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা

রক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও রক্ষিত এলাকার ন্যায় কাজ করছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ইকোপার্ক, কুঞ্জবন এবং সাফারি পার্ক এর তালিকা নিম্নরূপ:

(ক) ইকোপার্ক:

১. সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক
২. বাঁশখালি ইকোপার্ক
৩. কুয়াকাটা ইকোপার্ক
৪. বরশীজোড়া ইকোপার্ক
৫. যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক
৬. পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক

(খ) কুঞ্জবন:

১. কুঞ্জবন (বলধা গার্ডেন)

(গ) সাফারি পার্ক :

১. ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার
২. গাজীপুর সাফারি পার্ক, গাজীপুর

সাফারি পার্কে সকল বন্যপ্রাণী উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে এবং মানুষ যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে উন্মুক্ত জীবজন্তু পরিদর্শন করে থাকে। সাফারি পার্কে দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণী যথাসম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারি পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারি পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে ২টি সাফারি পার্ক রয়েছে। সাফারি পার্ক ২টির বর্ণনা নিম্নরূপ:

ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার

বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন অঞ্চল কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার চট্টগ্রাম- কক্সবাজার মহাসড়কের পূর্ব পাশে ডুলাহাজারা রিজার্ভ ফরেস্ট ব্লকের মনোরম প্রাকৃতিক চিরহরিৎ বনাঞ্চলে ডুলাহাজারা সাফারি পার্কটি অবস্থিত। এক সময় এখানকার চির সবুজ বনাঞ্চলে ছিল গগনচুম্বি গর্জন, বৈলাম, তেলসুর, সিভিট, চাপালিশ, চম্পাফুল ও বিবিধ লতাগুল্ম। সমৃদ্ধ এই বনাঞ্চলে দেখা যেত হাতি, বাঘ, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, ভালুক, বানরসহ অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও সরীসৃপের অবাধ বিচরণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অবৈধ শিকার ও পাচারের ফলে এ বনাঞ্চলের অসংখ্য উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী হারিয়ে যেতে থাকে। তৎকালীন কক্সবাজার বনবিভাগ কর্তৃক ১৯৮২ সালে স্থানীয় প্রজাতির হরিণ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে ডুলাহাজারা ব্লকে ৪২.৫ হেক্টর এলাকা নিয়ে একটি হরিণ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে উঁচু নিচু টিলা সমৃদ্ধ চির সবুজ এই বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন এবং শিক্ষা, গবেষণা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন সহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষে উক্ত হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটির পরিসর বৃদ্ধি করে ৩০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে ২০০১ সালে দেশের প্রথম সাফারি পার্ক হিসেবে ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে সাফারি পার্কের আয়তন পর্যায়ক্রমে ৬০০ হেক্টর বৃদ্ধি করে ৯০০ হেক্টরে উন্নিত করা হয়। বিদ্যমান পার্কটিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাফারি পার্কে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ১০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৬ মেয়াদে ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার এর প্রধান ফটক

ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, কক্সবাজার এর বিভিন্ন বেষ্টনীতে দেশি-বিদেশি ২৬ প্রজাতির ২৯১ টি পাখি, ৭ প্রজাতির ৫৯ টি সরীসৃপ এবং ১৭ প্রজাতির ১৬৬ টি স্তন্যপায়ী প্রাণী বিদ্যমান। এছাড়াও সাফারি পার্কটিতে প্রায় ৩৪০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও উন্মুক্ত অবস্থায় আনুমানিক প্রায় ২০০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। সাফারি পার্কটিতে ইতোমধ্যে কালো ভালুক, গয়াল, ওয়াইল্ডবিষ্ট, জেব্রা, লোনা পানির কুমির, উটপাখি, ইমু, মদনটাকসহ বিভিন্ন প্রাণীসমূহের কনজারভেশন ও ব্রিডিং-এ সফলতা পাওয়া গিয়েছে।

বিগত ৫ বছরে কনজারভেশন ব্রিডিং /কেপটিভ ব্রিডিং এ সাফল্যের তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	বাচ্চার সংখ্যা
১.	গয়াল	১৫টি
২.	কালো ভাল্লুক	০৮টি
৩.	চিত্রা হরিণ	০৬টি
৪.	মায়া হরিণ	০৩ টি
৫.	মদনটাক	০২টি
৬.	জেব্রা	০৫টি
৭.	ওয়াইল্ডবিস্ট	০৫টি
৮.	লোনা পানির কুমির	০৩টি
৯.	বন মোরগ	শতাধিক
১০.	কালিম	শতাধিক
১১.	উট পাখি	০৪টি
১২.	ইমু পাখি	১০টি
১৩.	হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ	০২ টি
১৪.	নীলগাই	০১টি
১৫.	ময়ূর	৪০টি

সাফারি পার্কের বিশেষ আকর্ষণ:

- প্রাকৃতিক বনের ভেতর পায়ে হাঁটা পথ (নেচার ফুট ট্রেইল)
- থিমেটিক চিল্ড্রেন এমিউজমেন্টপার্ক
- দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার
- কুমিরের বেষ্টনীর উপর বোর্ড ওয়াক
- জু-জোনে রক্ষিত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রাণী দর্শন
- হার্বিভোর সাফারি পরিভ্রমণ
- সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

ওয়াচ টাওয়ার

থিমেটিক চিলড্রেন এমিউজমেন্ট পার্ক

দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এমপি ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান ১৩ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখ ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাফারি পার্কে একটি নাগলিঙ্গম বৃক্ষের চারা রোপণ করেন এবং সাফারি পার্ক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে পার্কের সাফল্য কামনা করে তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী পরিদর্শন বই-এ মতামত ব্যক্ত করেন।

গাজীপুর সাফারি পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারি পার্কটির অবস্থান। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খণ্ড খণ্ড শাল বনের ৪৯০৯ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০ একর এলাকাকে সাফারি পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সাফারি পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল, বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারি ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাফারি পার্কের চারদিকে নির্মাণ করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং এর মধ্যে দেশি/বিদেশি বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে; যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

প্রবেশদ্বার, সাফারি পার্ক, গাজীপুর

এই পার্ক ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত

১। কোর সাফারি ২। সাফারি কিংডম ৩। বায়ো-ডাইভারসিটি পার্ক

৪। এক্সটেনসিভ এশিয়ান সাফারি পার্ক ৫। পার্ক স্কয়ার।

সাফারি পার্কে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর সারসংক্ষেপ

শ্রেণী/ প্রাণী	প্রজাতির সংখ্যা	প্রাণীর সংখ্যা (টি)
স্তন্যপায়ী	২১	৩২০
সরীসৃপ	১৩	৩৪৩
পাখি	৪০	৩৬৯ (কম/বেশি)
মাছ	১	৪০০ (কম/বেশি)
মোট	৭৫	১৪৩২

অন্যান্য এলাকা ভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)

জাতিসংঘের বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচি Convention on Biological Diversity (CBD) কর্তৃক প্রবর্তিত একটি ব্যবস্থা হলো 'Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)' বা 'অন্যান্য এলাকাভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা'। OECM এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থানরত রক্ষিত এলাকাসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে থাকে। বাংলাদেশে OECM কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। OECM কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ এ ধারা ২৩ (৪) সংযোজনের মাধ্যমে "অন্যান্য এলাকাভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)" এর স্বীকৃতি প্রদান এবং ২৩ (৫) সংযোজনের এর মাধ্যমে স্বীকৃত OECM এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় IUCN-WCPA নির্দেশিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করতঃ দেশের OECMs সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং এর জন্য সরকার কর্তৃক National Guidelines for Assessing, Reporting and Managing Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) in Bangladesh প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে। জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত মূল্যায়নকারী দল (Assessors) ও যাচাইকারী দলের (Verifiers) মাধ্যমে অনুমোদিত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রার্থী OECM গুলোকে মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাইপূর্বক World Database on OECM এ রিপোর্টিং এর জন্য উত্থাপন করা হয়ে থাকে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত SUFAL প্রকল্পের 'Innovation Grant' এর সহায়তায় আরণ্যক ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৬০ টি সম্ভাব্য OECM সাইট চিহ্নিত করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ঐ সাইটগুলোর মধ্য থেকে ৪৮ টি সাইট OECM সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির বা NTAC এর ১ম সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচিত ৭ জন মূল্যায়নকারী (Assessors) IUCN-WCPA নির্দেশিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত সাইটগুলো মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নকারীবৃন্দ ৪৮ টি সাইটের মধ্যে ৩৬ টিকে OECM হিসাবে নিশ্চিত (Confirmed) করেন এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতিপত্র না থাকায় অপর ১২ টি সাইট প্রার্থী (Candidate) পর্যায়ে রয়ে যায়। পরবর্তীতে OECM সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত যাচাইকারী দলের (Verifiers) মূল্যায়নকারীবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত সাইট গুলির মধ্য থেকে ৬টির যাচাই কাজ সম্পন্ন করেন। তদপ্রেক্ষিতে যাচাইকৃত এই ৬ টি সাইট (যার মধ্যে ৫ টি পার্বত্য অঞ্চলের VCF ও ১ টি ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি, পিটাছড়া, খাগড়াছড়ি) NTAC এর অনুমোদন (OECM হিসেবে স্বীকৃতি) সাপেক্ষে WD-OECM বা OECM সংক্রান্ত বৈশ্বিক তথ্য ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এছাড়া ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ডব্লিউ সি এস) এর কারিগরি সহায়তায় দেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২৭০০ বর্গ কি. মি. এলাকাকে মেরিন OECM হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কার্যক্রম চলমান। জনসখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অস্বাভাবিক নির্ভরতা ও বনভূমির স্বল্পতার কারণে Global Biodiversity Framework (GBF) এর 30x30 লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু OECM কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের রক্ষিত এলাকার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। IUCN এর ২০১৫ সালের জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রজাতি রয়েছে। মেরুদণ্ডী বন্যপ্রাণীর মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও ১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। এছাড়া অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাস্টোসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাপতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট, ২০১৫

Red List হলো প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব প্রজাতির সংরক্ষণাবস্থা ও বিপদাপন্নতার মাত্রা নির্ধারণের একটি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নভিত্তিক তালিকা, যেখানে প্রজাতিগুলোকে তাদের অস্তিত্বের ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন সংরক্ষণ ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়।

দল	মোট বসবাসরত প্রজাতি	বিলুপ্ত (Extinct)	মহাবিপন্ন (Critically Endangered)	বিপন্ন (Endangered)	সংকটাপন্ন (Vulnerable)	হুমকির সম্মুখীন (Near Threatened)	ঝুঁকিপূর্ণ নয় (Least Concern)	অপ্রতুল তথ্য (Data Deficient)	মূল্যায়িত নয় (Not Evaluated)
স্তন্যপায়ী প্রাণী	১৩৮	১১	১৭	১২	৯	৯	৩৪	৩৯	৭
পাখি	৫৬৬	১৯	১০	১২	১৭	২৯	৪২৪	৫৫	০০
সরীসৃপ	১৬৭	১	১৭	১০	১১	১৮	৬৩	২৭	২০
উভচর	৪৯	০০	২	৩	৫	৬	২৭	৬	০০
মিঠা পানির মাছ	২৫৩	০০	৯	৩০	২৫	২৭	১২২	৪০	০০
ক্রাস্টোসিয়ান	১৪১	০০	০০	২	১১	১	৪৭	৭৯	১
প্রজাপতি	৩০৫	০০	১	১১২	৭৫	০০	৮৫	৩২	০০
মোট	**১৬১৯**	**৩১**	**৫৬**	**১৮১**	**১৫৩**	**৯০**	**৮০২**	**২৭৮**	**২৮**

বাংলাদেশ এক সময় প্রাণী বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। IUCN এর ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত শত বর্ষের ব্যবধানে আমাদের দেশ থেকে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি স্তন্যপায়ী, ১৯টি পাখি ও ১টি সরীসৃপ প্রজাতি। বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর তালিকায় রয়েছে ধূসর নেকড়ে, ডোরাকাটা হায়েনা, শ্লথ ভল্লুক, নীলগাই, বান্টিং বা বনগরু, বুনো মহিষ, কৃষ্ণ মৃগ, বারশিঙ্গা, সুমাত্রান গন্ডার, জাভা গন্ডার, এক শিংগা গন্ডার, লালগলা বাতাই, দেশি ময়ূর, সবুজ ময়ূর, মেটে তিতির, বাদা তিতির, বাদি হাঁস, গোলাপি হাঁস, সারস. বাংলা ডাহর, পাতি ডাহর, হাড়গিলা বা মদনটাক, ধলাপেট বগ, চিতিঠোটি গগনবেড়, রাজ শকুন, লালমুখ দাগিডানা, কালাবুক টিয়াঠুঁটি, তিলাবুক টিয়াঠুঁটি, লাল-মাথা টিয়াঠুঁটি, দাগিলেজ গাছআঁচড়া ও মিঠাপানির কুমির

Indian Rhinoceros
(Rhinoceros unicornis)

Javan Rhinoceros
(Rhinoceros sondaicus)

Sumatran Rhinoceros
(Dicerorhinus sumatrensis)

Swamp Deer
(Rucervus duvaucelii)

Blackbuck
(Antilope cervicapra)

Nilgai
(Boselaphus tragocamelus)

Banteng
(Bos javanicus)

Wild Buffalo
(Bubalus arnee)

Grey Wolf
(Canis lupus)

Striped Hyena
(Hyaena hyaena)

Pink-headed Duck
(Rhodonessa caryophyllacea)

Marsh Crocodile
(Crocodylus palustris)

বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী

বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রম (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)

বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট হালনাগাদকরণ প্রকল্পটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের (MoEFCC) আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে International Union for Conservation of Nature (IUCN) এর Red List of Threatened Species বর্তমানে পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তির ঝুঁকি মূল্যায়নের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসেবে স্বীকৃত। বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের সুস্থতা ও পরিবর্তন মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে IUCN Red List বিপদাপন্ন (Threatened) প্রজাতি শনাক্তকরণের পাশাপাশি সংরক্ষণ পরিকল্পনা, নীতি-প্রণয়ন, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বৈশ্বিক সংরক্ষণ অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। প্রজাতির বিস্তৃতি, সংখ্যা, আবাসস্থল, ব্যবহার ও বাণিজ্য, হুমকিসমূহ এবং সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কিত নির্ভুল ও সুসংগঠিত তথ্য Red List কে বিশ্বের সংরক্ষণ সংস্থা ও গবেষকদের জন্য এক অনন্য ও অপরিহার্য সম্পদে পরিণত করেছে। এ পর্যন্ত স্তন্যপায়ী, উভচর, পাখি, মিঠাপানির মাছ, প্রাচীর-গঠনকারী প্রবাল এবং উদ্ভিদসহ বিভিন্ন প্রজাতি ও প্রজাতি গোষ্ঠীর বিস্তারিত বৈশ্বিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নতুনভাবে স্বীকৃত প্রজাতিগুলোর মূল্যায়নের পাশাপাশি IUCN Red List পূর্বে মূল্যায়িত প্রজাতিগুলোর সংরক্ষণাবস্থা নিয়মিতভাবে পুনর্মূল্যায়ন করে থাকে। IUCN Red List Strategic Plan (২০২১-২০৩০) অনুযায়ী ২,৬০,০০০ প্রজাতি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, এ পর্যন্ত ১,৭২,৬০০ এর বেশি প্রজাতির অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে, এর মধ্যে ৪৮,৬০০ এর বেশি প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাণিকুলের Red List হালনাগাদকরণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। ২০১৫ সালে মূল্যায়িত সব প্রজাতির সংরক্ষণাবস্থা পুনরায় নির্ধারণ করা হবে, যাতে তাদের সংখ্যাগত পরিবর্তন, আবাসস্থলের বর্তমান অবস্থা এবং হুমকি সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য প্রতিফলিত হয়। ২০২৬-২০২৭ সালের বিস্তৃত মূল্যায়ন কাঠামোর মাধ্যমে অন্তত ৬০০টির অধিক নতুন প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণিকুল বিশেষত সামুদ্রিক মাছ, হাঙর, রে মাছ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রজাতি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এসব সামুদ্রিক প্রজাতির মূল্যায়ন ভবিষ্যতের টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) পরিকল্পনা এবং উপকূলীয় সংরক্ষণ কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করবে। ফলে, এই হালনাগাদ মূল্যায়ন কেবল প্রজাতির তালিকা সম্প্রসারণ নয় বরং বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এক কৌশলগত ও অগ্রগামী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। ২০২৬-২০২৭ সালের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান শক্তি হলো এর পদ্ধতিগত দৃঢ়তা ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড মেনে চলা। IUCN Red List Categories and Criteria এবং সর্বশেষ Regional ও National Red List Assessment Guidelines অনুসরণ করে প্রতিটি প্রজাতির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, প্রকাশিত গবেষণা, গ্রে লিটারেচার, মাঠ পর্যবেক্ষণ, জাদুঘরের সংগ্রহ এবং সিটিজেন সায়েন্সসহ নানা উৎস থেকে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সংরক্ষণ সংস্থা এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এই মূল্যায়নকে আরও শক্তিশালী করবে।

চলমান প্রকল্পের আওতায় ৯টি Red List Assessor Group (RAGs) গঠন করা হয়েছে, (১) উভচর (Amphibians), (২) সরীসৃপ (Reptiles), (৩) পাখি (Birds), (৪) স্তন্যপায়ী (Mammals), (৫) ক্রাস্টেসিয়ান (Crustaceans), (৬) প্রজাপতি (Butterfly), (৭) মিঠাপানি মাছ (Freshwater fish), (৮) সামুদ্রিক মাছ (Marine fish), (৯) হাঙর-রে (Sharks and Rays) এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী। এই ৯টি Red List Assessor Group (RAGs) অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশব্যাপী বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও মূল্যায়নকারীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করছে। প্রত্যেকটি গ্রুপের জন্য ১ টি করে মোট ৯টি ভলিউম, ইংরেজি সামারি ভলিউম ১টি, বিস্তারিত বাংলা ভার্সন ১টি সহ সর্বমোট ১১টি ভলিউম রেডলিস্ট প্রকাশ করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে প্রাণিকুলের Red List হালনাগাদ সম্পর্কিত সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই একটি National Committee for Updating Faunal Red List of Bangladesh (NC-UFRL) গঠন করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল রেড লিস্ট বিষয়ক ওয়েববেইজড প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা ও ডাটাসেট হালনাগাদ করে বন অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হবে। এই উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সক্ষমতা বৃদ্ধি। বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, তরুণ গবেষক এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞসহ ২০০ এর বেশি মূল্যায়নকারী

IUCN Red List Unit এবং IUCN Bangladesh এর স্বীকৃত প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উচ্চমানের মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে সুসংগঠিত কর্মপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে এবং সব তথ্য www.bforest.gov.bd তে প্রকাশিত হবে। একটি উন্নত ওয়েবভিত্তিক জাতীয় Red List প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে, যেখানে অনুসন্ধানযোগ্য প্রজাতির প্রোফাইল, মানচিত্র, ছবি ও মূল্যায়ন নথি সংরক্ষিত থাকবে এবং এটি বাংলাদেশ বন তথ্য ব্যবস্থা (BFIS) এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। একই সঙ্গে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ও IOS অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ, গবেষক, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রজাতি সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত পৌঁছে দেবে।

বন অধিদপ্তর ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি

মূল্যায়নকারীদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের উদ্ভিদকুলের রেড লিস্ট

বাংলাদেশের উদ্ভিদকুলের রেড লিস্ট বা লাল তালিকা বন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক আইইউসিএন-এর মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সুফল (Sustainable Forests and Livelihoods) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশের উদ্ভিদকুলের রেড লিস্ট দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন। এই প্রকাশনায় ১,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৫টি মহাবিপন্ন (Critically Endangered), ১২৭টি বিপন্ন (Endangered) এবং ২৬৩টি সংকটাপন্ন (Vulnerable)। এছাড়া ২৭১ প্রজাতি ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত, ২৫৬ প্রজাতির তথ্য অপ্রতুল, ৭০টি প্রজাতি প্রায়-বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এবং ৭টি প্রজাতি দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রেড লিস্টের তথ্য দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম এবং জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

Plant Group	Red List Category								
	EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Total
Pteridophytes				2					2
Gymnosperms			1	1	2				4
Magnoliids	1			19	23	8	10	36	97
Monocots		1	3	9	24	3	23	13	76
Eudicots	6		1	96	214	59	238	207	821
Total	**7**	**1**	**5**	**127**	**263**	**70**	**271**	**256**	**1000**

বাংলাদেশের ১০০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতীর রেড লিস্ট অবস্থা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ

- সুন্দরবন ও এ বনের বন্যপ্রাণী রক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচ বছর মেয়াদি "সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ১৫৯ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পে সুন্দরবন এবং এই বনের বন্যপ্রাণী রক্ষায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম, ইকোলজিক্যাল মনিটরিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এছাড়া সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে "সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ গণনা, শিকার প্রাণীর সংখ্যা নির্ণয়, খাল সার্ভে, সুন্দরবনের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় নাইলনের রশির বেষ্টনী তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কমকর্তা-কর্মচারীদের ড্রোন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে, ড্রোন ব্যবহার করে সুন্দরবনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- চলমান 'হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প' এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং বন্যপ্রাণীর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট/NOC প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশি পাখি আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণ

স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতি বৃহত্তম। পৃথিবীতে দুই প্রজাতির হাতি দেখতে পাওয়া যায়- একটি এশীয় হাতি এবং অপরটি আফ্রিকান হাতি। এরা সকলেই Proboscidea বর্গভুক্ত এবং Elephantidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এশীয় হাতির বৈজ্ঞানিক নাম *Elephas maximus*। হাতিরা সামাজিক প্রাণী এবং একটি বনের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের নিয়ামক। বিশ্বের ১৩টি দেশে এখনও এশীয় হাতি টিকে আছে যার সংখ্যা ৩৫,০০০ থেকে ৫০,০০০; এর অধিকাংশই আবার ভারতীয় উপমাহাদেশেই অবস্থান করছে যা বন্য হাতিদের মোট সংখ্যার শতকরা ৬৬.৪ ভাগ (আইইউসিএন- ২০১৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসস্থল খণ্ডায়ন ও সংকোচন, হাতির চলাচলের পথ ও করিডোরে অবকাঠামো নির্মাণ, খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে হাতির টিকে থাকার চাপ বাড়ছে। একই সাথে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এই বৃহদাকার প্রাণীটি রক্ষায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রতিকূলতা তৈরি হচ্ছে। এ সকল প্রতিকূলতা নিরসনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প" বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এক অনন্য ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন মেয়াদি এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্য হাতির বিলুপ্তি রোধ, তাদের নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিত করা এবং হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব হ্রাস করা। আইইউসিএন বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ২০১৫ সালে বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত ২১০-৩৩০ টি, পরিযায়ী ৭৯-১০৭ টি এবং ৯৬টি পোষা হাতি রয়েছে। "হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে বর্তমানে পুনরায় হাতি জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা:

প্রকল্পটি দেশের ১১টি জেলার ৪টি বিভাগে হাতির প্রাকৃতিক আবাসস্থল উন্নয়ন ও করিডোর সংরক্ষণে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৫০ হেক্টর জমিতে হাতির খাদ্য উপযোগী বিশেষ বৃক্ষরোপণ, ৫০ হেক্টর বাঁশবাগান এবং ১০ কি.মি. ইকোলজিক্যাল বাউন্ডারি বায়োফেন্সিং সৃজন করা হবে। হাতির পানির চাহিদা পূরণে প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ ও নতুন জলাধার খননের মাধ্যমে বনের সামগ্রিক বাস্তুসংস্থান সমৃদ্ধ করা হবে।

হাতি ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বেত, লেবু ও বরই এর মতো কাঁটাজাতীয় গাছ দিয়ে "বায়োফেন্সিং" বা জীবন্ত বেড়া নির্মাণ করা হবে, যা পরিবেশবান্ধব উপায়ে হাতির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে। পাশাপাশি Elephant Response Team ও Elephant Rescue Team গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণ ও স্মার্ট পেট্রোলিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবেষণা:

প্রকল্পে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রি টাওয়ার নির্মাণ ও হাতির গলায় জিপিএস কলার স্থাপনের মাধ্যমে হাতির গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। আহত বা বিপন্ন হাতিদের সুরক্ষায় গাজীপুর ও ডুলাহাজারায় দুটি বিশেষায়িত হাতি উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। হাতি-মানুষ দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয়ে নৃতাত্ত্বিক জরিপ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভারতের সাথে বিদ্যমান আন্তঃদেশীয় সমঝোতা স্মারক কার্যকর করে সীমান্ত এলাকায় হাতির চলাচলের পথও সুরক্ষিত করা হবে।

হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান সৃজন

ERT সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ ও জরিপ ২০২৪

বাঘ বাংলাদেশের বীরত্বের প্রতীক এবং সুন্দরবনের ভারসাম্য রক্ষায় এক অপরিহার্য পাহারাদার। আইইউসিএন (IUCN) কর্তৃক মহাবিপন্ন (Critically Endangered) ঘোষিত এই প্রাণীটি বিশ্বের ১৩টি দেশে থাকলেও বর্তমানে ১০ টি দেশের প্রকৃতিতে বাঘ টিকে আছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 'সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ মাসব্যাপী এই জরিপ সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা, চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জের ৪টি ব্লকে পরিচালিত হয়। মোট ৬০৫টি গ্রিডের ২২৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ১,২১০টি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ব্যবহার করে ৩১৮ দিনব্যাপী এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হয়। সংগৃহীত ১১ লক্ষাধিক ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে ৭,২৯৭টি বাঘের ছবি পাওয়া যায়। এসইসিআর (SECR) মডেলে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাঘের গড় আপেক্ষিক ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে ২.৬৪। এবারের জরিপে মোট ১২৫টি বাঘের অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া গেছে, যার মধ্যে ৮৪টি পূর্ণবয়স্ক (২১টি পুরুষ, ৬২টি বাঘিনী ও ১টি জুভেনাইল) এবং ১৯টি শাবক রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি এবং ২০১৮ সালে ১১৪টি; যা ২০২৪ সালে এসে ১২৫টিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৮ সালের তুলনায় বাঘের সংখ্যা ৯.৬৫ শতাংশ এবং ২০১৫ সালের তুলনায় ১৭.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনে বাঘের এই ধারাবাহিক সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক সংবাদ। বাঘের এই বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বন অধিদপ্তর স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নতুন মাইলফলক: সুন্দরবনের গুরুতর আহত বাঘিনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ

২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের শরকির খাল এলাকা থেকে একটি গুরুতর আহত বাঘিনীকে উদ্ধার করা হয়। চোরা শিকারিদের পাতা ফাঁদে আটকে তার পায়ে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল এবং শারীরিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক, সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাবৃন্দ, ভেটেরিনারি চিকিৎসক এবং বনকর্মীদের নিবিড় পরিচর্যা ও বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাঘিনীটি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, খুব দ্রুতই বাঘিনীটিকে সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হবে। মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়ানো এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০২৪ সালের ক্যামেরা ট্র্যাপিং তথ্যের ভিত্তিতে তার সম্ভাব্য নিজস্ব

বিচরণক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে সুন্দরবনের গভীর অঞ্চলে অবমুক্ত করা হবে। এই সফল পুনর্বাসন কার্যক্রম বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং মহাবিপন্ন বেঙ্গল টাইগার রক্ষায় বন অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

উদ্ধারকৃত বাঘিনী

সম্পূর্ণ সুস্থ বাঘিনী

কুমির সংরক্ষণ

সুন্দরবনের লোনা পানির কুমির (বৈজ্ঞানিক নাম: *Crocodylus porosus*) অনন্য ম্যানগ্রোভ বনের বাস্তুসংস্থানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জলাশয়ের প্রধান শিকারি। শক্তিশালী দেহ, দীর্ঘ লেজ এবং ধারালো দাঁতের অধিকারী এই দক্ষ শিকারি সুন্দরবনের নদী, খাল ও মোহনার লোনা পানিতে বিচরণ করে এবং জলজ প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন অধিদপ্তর ও কারিনাম এর ২০১৭ সালের জরিপে দেখা যায় সুন্দরবনে প্রাকৃতিকভাবে ১৫০-২১০ টি লোনাপানির কুমির রয়েছে। এই প্রজাতিটির সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের অধীনে ২০০২ সালে ৮.০ একর জায়গার ওপর সরকারিভাবে 'করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রটির মূল লক্ষ্য হলো কনজারভেশন ব্রিডিং-এর মাধ্যমে কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে পর্যটকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করা। বর্তমানে এই কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন- পালন ও প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পুকুরের পাড় হতে অরক্ষিত ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে বাচ্চা ফোটানো হয় এবং বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা প্যানে সুশৃঙ্খলভাবে লালন-পালন করা হয়। সাধারণত কুমিরের বয়স ৭-৮ বছর হলে অথবা দৈর্ঘ্য ২.০ মিটার বা তার বেশি হলে তাদের সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ২টি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ২টি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী কুমিরসহ মোট ৯২টি কুমির রয়েছে।

সুন্দরবনের লোনা পানির কুমির

মাস্কড ফিনফুট সংরক্ষণ

মাস্কড ফিনফুট

মাস্কড ফিনফুট (বৈজ্ঞানিক নাম: *Heliopais personatus*) একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও লাজুক জলপাখি, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন (Critically Endangered) হিসেবে চিহ্নিত। উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি থাকলেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এদের জনসংখ্যা মাত্র ১০৮-৩০৪টি বলে অনুমান করা হয় (বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল, ২০২২)। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের সুন্দরবনে প্রায় ৮০-১৬০টি পাখি অবশিষ্ট থাকতে পারে (চৌধুরী এবং অন্যান্য, ২০২০)। সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানে এই পাখির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এরা বহুমুখী হুমকির সম্মুখীন। বিশেষ করে সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরা, চরপাটা ও খালপাটা জালের ব্যবহার, পর্যটকদের অসচেতনতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এই প্রজাতিটি চরম অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। বন অধিদপ্তর, IUCN এবং GIZ-এর যৌথ গবেষণার ভিত্তিতে এই পাখিটি সংরক্ষণে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সুন্দরবনের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ খালকে মাস্কড ফিনফুটের 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রজনন মৌসুমে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) এই খালগুলোতে পর্যটক ও সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বছরজুড়ে সব ধরণের মাছ ধরা বন্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া পর্যটক ও ট্যুর অপারেটরদের সচেতনতা বৃদ্ধি, জলযানসমূহকে পাখি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল নিশ্চিত করা এবং খালের প্রবেশপথে বাংলা ইংরেজিতে নির্দেশিকা সংবলিত বিলবোর্ড স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সুন্দরবনের এই অনন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি এই উদ্যোগগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ডলফিন সংরক্ষণ

বাংলাদেশের নদী, উপকূল এবং সামুদ্রিক জলজ পরিবেশে মোট ১৩ প্রজাতির সিটাসিয়ান (ডলফিন, তিমি, পরপয়েস) পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গাঙ্গেয় ডলফিন- শুশুক (*Platanista gangetica*) সম্পূর্ণরূপে মিঠাপানির বাসিন্দা, ইরাবতী ডলফিন (Irrawaddy Dolphin) মিঠা ও লোনা পানির সংযোগস্থল বা মোহনা অঞ্চলে বিচরণ করে এবং অবশিষ্ট ১১ প্রজাতির সিটাসিয়ান সামুদ্রিক বা লোনা পানির পরিবেশে বসবাস করে।

IUCN গ্লোবাল রেড লিস্ট অনুযায়ী শুশুক ও ইরাবতী ডলফিন উভয়ই বিপন্ন (Endangered) প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত। আবাসস্থল ধ্বংস, নদী দূষণ, মাছ ধরার জালে দুর্ঘটনাজনিত আটকা পড়া, নৌযানের চলাচল এবং অন্যান্য মানবসৃষ্ট চাপের কারণে এ দুটি প্রজাতি নানা হুমকির সম্মুখীন।

দেশের এই মূল্যবান জলজ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় "ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান (২০২১-২০৩০)" প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে ২০২৬-২০৩৫ সময়কালের জন্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, অবৈধ শিকার ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুশুক ও ইরাবতী ডলফিনের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জলজ বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে।

মিঠাপানির ডলফিন সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এদের গুরুত্ব তুলে ধরতে বন অধিদপ্তর প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর "আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস" (International Freshwater Dolphin Day) পালন করে। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ডলফিন সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, গবেষণা কার্যক্রম উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলোকে রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪ সালে শুশুকের আবাসস্থল, বিস্তৃতি এবং জনসংখ্যা সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (WCS) এর সহায়তায় দেশব্যাপী একটি বিস্তৃত জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল শুশুকের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন, এর আবাসস্থলের পরিবেশগত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।

২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর সম্ভাব্য ডলফিন আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত ৩,৩৮৩ কিলোমিটার নদীপথে এই জরিপ পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে সুন্দরবনের ১,৫১০ কিলোমিটার জলপথে পূর্বে পরিচালিত জরিপের তথ্য যুক্ত করলে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৪,৮৯৩ কিলোমিটার জলপথে শুশুকের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে দেশে গাঙ্গেয় শুশুকের মোট সংখ্যা প্রায় ২,৩০৭টি।

শুশুক সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলকে ২৫টি ডলফিন হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে পাবনা জেলার নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য ও ৭টি গুরুত্বপূর্ণ ডলফিন হটস্পটে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ডলফিন কনজারভেশন টিম (Dolphin Conservation Team - DCT) গঠন করা হয়েছে। DCT এর সদস্যরা ডলফিন সংরক্ষণে মাঠপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তারা জালে জড়িয়ে পড়া, চরে আটকে পড়া বা বিপদগ্রস্ত ডলফিন উদ্ধার ও নিরাপদে অবমুক্তকরণ, ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণ, হটস্পট এলাকার পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে বন অধিদপ্তরকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে DCT সদস্যদের জন্য একটি "ডলফিন কনজারভেশন হ্যান্ডবুক" প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সদস্য ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে। DCT এর কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদানের জন্য সদস্যদের মাঝে স্ট্রেচার, বডি ভেস্ট, ক্যাপ, রেইনকোট, ছাতা, টি-শার্ট, টর্চলাইট, বাঁশিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন সংরক্ষণের গুরুত্ব, হুমকি এবং করণীয় বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হটস্পট এলাকাগুলোতে একাধিক আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে শুশুক সংরক্ষণে একটি অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে উঠছে, যা দেশের এই বিপন্ন জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীর দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ঘড়িয়াল সংরক্ষণ

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*) বাংলাদেশের একটি মহাবিপন্ন (Critically Endangered) সরীসৃপ প্রজাতি। একসময় পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও মহানন্দাসহ দেশের বিভিন্ন বৃহৎ নদীতে এদের বিস্তৃতি থাকলেও জলজ পরিবেশের অবক্ষয়, আবাসস্থল ধ্বংস, নদীর গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন এবং মানবসৃষ্ট নানা চাপের কারণে বর্তমানে এদের উপস্থিতি মূলত পদ্মা ও যমুনা নদীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২০১৬ ও ২০২৩ সালে পরিচালিত গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ঘড়িয়ালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলসমূহের মধ্যে রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পদ্মা নদীর বাকর আলী চর, রাজশাহী জেলার পদ্মা নদীর গোদাগাড়ির চর, গহমাবোনা ও খিদিরপুর এলাকা, মানিকগঞ্জ জেলার পদ্মা নদীর শিবালয় এলাকা এবং বগুড়া জেলার যমুনা নদীর কাজলার চর। এসব স্থান বর্তমানে ঘড়িয়ালের টিকে থাকা ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে এসব আবাসস্থলের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মহাবিপন্ন ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*) সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করছে। ঘড়িয়ালের আবাসস্থল সংরক্ষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ১০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ঘড়িয়াল সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, বংশবৃদ্ধি এবং প্রজনন কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঘড়িয়ালের কৃত্রিম প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য রাজশাহী জেলার পবা নার্সারি এলাকায় ২ একর জমির ওপর একটি ঘড়িয়াল ব্রিডিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে গাজীপুর সাফারি পার্ক থেকে আনা ১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রী ঘড়িয়াল পালন করা হচ্ছে।

এছাড়া, পদ্মা ও যমুনা নদীর ঘড়িয়াল হটস্পট এলাকাগুলোতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ৬টি ঘড়িয়াল কনজারভেশন টিম (Gharial Conservation Team-GCT) গঠন করা হয়েছে। এসব দলের সদস্যদের ঘড়িয়াল সংরক্ষণ, আবাসস্থল সুরক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৬টি ঘড়িয়াল ক্যাপটিভ (Captive) অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহীর ঘড়িয়াল ব্রিডিং সেন্টারে ২টি (১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রী), গাজীপুর সাফারি পার্কে ৫টি (১টি পুরুষ ও ৪টি স্ত্রী), রাজশাহী চিড়িয়াখানায় ২টি (১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রী), রংপুর চিড়িয়াখানায় ৩টি (১টি পুরুষ ও ২টি স্ত্রী) এবং বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় ৪টি (১টি পুরুষ ও ৩টি স্ত্রী) ঘড়িয়াল সংরক্ষিত রয়েছে।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর দেশের অবশিষ্ট ঘড়িয়াল সংরক্ষণ, প্রজনন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে পুনঃঅবমুক্তকরণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রতিরোধ, দমন এবং উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিটটি নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী উদ্ধার, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করে থাকে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে ইউনিটটি নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পথসভা আয়োজন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, ভার্চুয়াল সভা আয়োজন এবং টহল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউনিটের নিজস্ব হটলাইনের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অপরাধীদের কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রদান এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত একটি সমন্বিত ডাটাবেস প্রণয়ন কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতন ব্যক্তি, সাধারণ জনগণ, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতেও ইউনিটটি নিয়মিতভাবে বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জুলাই ২০১২ হতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে ইউনিটটি সর্বমোট ৬১,১৫০ টি বন্যপ্রাণী জব্দ/উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধার/অভিযানের পাশাপাশি অত্র ইউনিট কর্তৃক বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ও বন্যপ্রাণী হ্যান্ডেলিং বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ২৫ টি জেলার ৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দেশের ৫৬ টি জেলার ২৪৫ টি স্থানে ৩০৭ টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং লক্ষাধিক পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম:

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অপরাধ দমন;
- বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, অপরাধ প্রবণ এলাকা (Hotspot) চিহ্নিতকরণ এবং নিয়মিত টহল কার্যক্রম পরিচালনা;
- মামলা দায়ের ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং DNA বারকোড ডাটাবেস প্রণয়ন;
- আহত, অসুস্থ বা লোকালয়ে প্রবেশ করা বন্যপ্রাণী উদ্ধার এবং উপযুক্ত পরিবেশে অবমুক্তকরণ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

আপনার একটি ফোনকল একটি বন্যপ্রাণী বা পাখির জীবন রক্ষা করতে পারে। বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত কোনো ঘটনা দেখা বা জানা মাত্রই Wildlife Crime Control Unit (WCCU) এর হট লাইন নম্বর (০১৯৯৯০০০০৯৫) অথবা জাতীয় জরুরি সেবা (৯৯৯)-এ কল করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০২৬পর্যন্ত)

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার/জব্দকৃত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা				মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধীর সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	ট্রফি		
২০২৬	৮৪	৮৭৭	১৩	৩৬৫	০১	০১	০১
২০২৫	৪১৫	৪৭৩৫	২৬০	৩২৯০	০১	০২	০২
২০২৪	২৩০	১২৭৫	৯৪	১৭৭৪	পাখির নখ ০৪ কেজি	৭	১৪ জন
২০২৩	৩১৬	২৫৯৩	১৫২	৬৪০	হাঙর ও শাপলাপাতা মাছ ৫ মণ এবং ময়ূরের পালক ১০০ কেজি	১০	১৩ জন
২০২২	৬১০	৪৭৪১	৪০৬	২০৮০	হাঙর ও শাপলাপাতার শুটকি ৮ মণ ৭ কেজি	১৭	৩৪ জন
২০২১	৩৬১	২৩২৩	৩০০	৮৩৬	২৪১	১২	১৯ জন
২০২০	৯৭	১৬৮৯	৩৫	৩৫	-	৭	১৬ জন
২০১৯	১২৯	৪৭৯৬	৭৭	১৩১	২৯৮	১৭	১৫ জন
২০১৮	১৪৭	৩৮৫০	৩৮	১৭	১৫	৯	১৪ জন
২০১৭	১১২	৪৪৫৫	১০	২০	-	০৪	০৫ জন
২০১৬	১৮৫	৩১৮৯	২৯	২৪৮	৪০	১৩	২৩ জন
২০১৫	১২৩	২৬৭৩	৩১	৭৬১৮	২৯০	২০	২৮ জন
২০১৪	১৪০	১২৫৭	২১	৫৪৮	৩১২	৯	১২ জন
২০১৩	১০০	২১২৪	৩০	৯২	০৩	৮	১৪ জন
২০১২	১৪১	৯৬১	১২	৪১০	২০৫	১৪	১২ জন
মোট	**৩১৯০**	**৪১৫৩৮**	**১৫০৮**	**১৮১০৪**	**১৪০৬**	**১৫০**	**২২২ জন**

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা কর্তৃক গাজীপুর জেলার সাইনবোর্ড সংলগ্ন বটতলা বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি পাখির গোডাউন থেকে অবৈধভাবে আটকে রাখা ৫২টি পাতি সরালি জব্দ কর হয়।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা কর্তৃক যাত্রাবাড়ী থেকে ফলো করে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা থেকে গোপালগঞ্জে পাচারের উদ্দেশ্যে বাসে করে নিয়ে যাওয়া প্রায় ১২০ কেজি কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এভিয়েশন সিকিউরিটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা এর যৌথ অভিযানে কাতার এয়ারওয়েজের বর্হিগামী একটি ফ্লাইটে পাচারের সময় তিনটি ঈগল/বাজ পাখি (Saker Falcon) জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা কর্তৃক রাজধানীর মিরপুর-০১ এলাকার কাঁচাবাজার ও পাখির দোকানগুলোতে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে আটক রাখা ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা মোট ৫০ টি দেশীয় বন্যপ্রাণী জব্দ করা হয়।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা কর্তৃক মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় মনোরম মিনি চিড়িয়াখানায় অভিযান পরিচালনা করে ২৭ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে চিকিৎসা শেষে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের কার্যক্রমের খন্ড চিত্র:

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আইন এবং CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) এর কার্যকর বাস্তবায়নে ফরেনসিক বিজ্ঞানের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তর ২০১৬ সালে ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে, যা দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আইন বাস্তবায়নে উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন মামলা আদালতে গড়ায়। ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, যেমন: প্রাণীর চামড়া, দাঁত, হাড়, রক্ত, পাখনা বা অন্য কোনো অংশের নমুনা থেকে প্রজাতি শনাক্তকরণ, প্রাণীর ট্র্যাফিকিং ট্রেইল চিহ্নিতকরণ এবং DNA বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধ শনাক্তকরণ।

ল্যাবটির মূল উদ্দেশ্য ট্রফি, দেহের প্রক্রিয়াজাত অংশ ও ডেরিভেটিভস-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীর প্রজাতি ও উৎস শনাক্তকরণ এবং জিনগত সিকোয়েন্সের ডেটাবেস তৈরি করা।

ল্যাবের কার্যক্রম

ল্যাব স্থাপনের পর থেকে মে, ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৪৮ (আটচল্লিশ) টি বিভিন্ন মামলার আলামত আদালত ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে এসেছে। যার মধ্যে ৩৪ টির বিশ্লেষণ কাজ সমাপ্ত করে বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট আলামতের বিশ্লেষণের কার্যক্রম চলমান আছে।

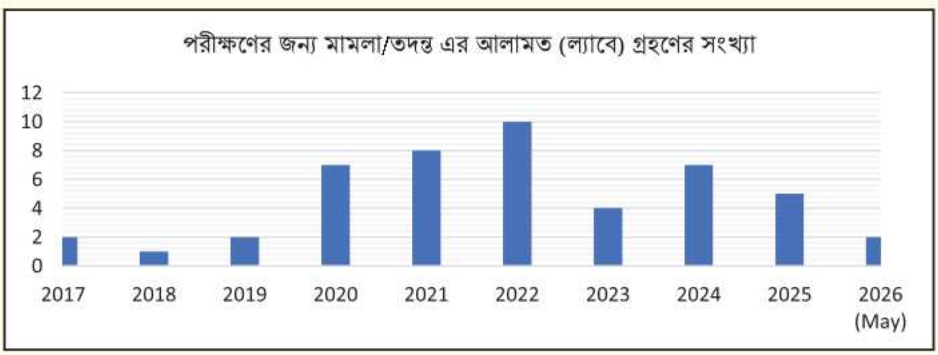

- বন্যপ্রাণী রিপোজিটরি উন্নয়নের লক্ষ্যে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর মোট ৬৫২টি নমুনা রিপোজিটরি নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব ডিএনএ বারকোডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বন্যপ্রাণীর একটি জেনেটিক বারকোডিং লাইব্রেরি সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। যা বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে সহযোগিতা করবে ও বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব সুফল প্রকল্প এর আওতায় "Genetics for tiger conservation Microsatellite based unified DNA fingerprinting to infer source of origin of tiger seizures in Bangladesh" শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ গবেষণার মাধ্যমে সুন্দরবনের বাঘের জিনগত বৈচিত্র্য, পৃথক শনাক্তকরণ এবং জব্দকৃত বাঘের আলামতের সম্ভাব্য উৎস নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে, যা বাঘ সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী অপরাধ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

❖ বর্তমানে "Establishing a Genetic Baseline for Pangolins in Bangladesh Using Mitochondrial DNA to Support Conservation and Forensic Applications" শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যমান প্যাঙ্গোলিন প্রজাতির জিনগত তথ্যভাণ্ডার তৈরি এবং ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ও ফরেনসিক বিশ্লেষণে একটি কার্যকর জেনেটিক বেইসলাইন প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর

দেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলায় গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৭ কি.মি. দূরে মাস্টারবাড়ী নামক স্থানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে অবস্থিত, যার মোট আয়তন ১৭.৫৮ একর।

উদ্দেশ্য

- জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতে পেশাজীবী, বন অধিদপ্তরসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দেশি-বিদেশি আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্মত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;
- দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন।

একাডেমিক ভবন

খেলার মাঠ

শ্রেণী কক্ষ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- গত ৯ অর্থ বছরে (২০১৭-২০২৬) মোট প্রশিক্ষণ ব্যাচ: ৭১ টি
- মোট ১৬টি শিরোনামে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে
- মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন: ১,৮২৩ জন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিধিমালা এবং নীতিমালা

- হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী আবেদনকারীর খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসনের লক্ষ্যে ২০২০ সালে 'অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০' জারি করা হয়েছে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদানের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১

"বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১" অনুযায়ী বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের ধরণ ও নির্ধারণের হার নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(১)	মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা)
(২)	গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
(৩)	সরকারি বনাঞ্চলের বাইরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে	অনধিক ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার টাকা)

২০১১-২০১২ থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

ক্র:নং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা (জন ব্যক্তি)						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১।	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২।	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩।	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪।	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫।	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬।	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭।	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
৮।	২০১৮-১৯	১১৫	৫	১	৭	১৬	-	১	৮৫	৪৩.০৫
৯।	২০১৯-২০	১২৩	-	-	১২	৩১	-	-	৮০	৫৪.৩৫
১০।	২০২০-২১	১৩৩	১	২	১০	১৬	-	-	১০৫	৬৯.৯৭
১১।	২০২১-২২	৫০১	১	১	৩১	১৩	১	-	৪৫৪	১৩০.৭২৫
১২।	২০২২-২৩	৩৪৬	১	-	১৭	২২	-	-	৩০৬	১১৯.৭৯৬
১৩।	২০২৩-২৪	৪৪৭	১	-	১০	১৯	-	-	৪১৮	১৭৯.৬৮২
১৪।	২০২৪-২৫	৮২২			৩৩	২৯			৭৬০	৩২০.৮০
মোটঃ		৩২১০	২০	৪৯	১৪৬	২৯৮	১	৬	২৭০৬	১১৯২.০৮৩

Flyway Site Network সম্পর্কিত তথ্য

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগোলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে পরিভ্রমণ করে থাকে, তাকে উড়ন্ত পথ (Flyways) বলে। পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে; তন্মধ্যে বাংলাদেশ East Asian- Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway এর অন্তর্ভুক্ত।

Central Asian Flyway

পরিযায়ী পাখি সম্পর্কিত পৃথিবীতে যে ৯টি Flyway Site Network আছে, তন্মধ্যে Central Asian Flyway (CAF) অন্যতম। Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) এর আওতায় পরিচালিত Central Asian Flyway সংক্রান্ত কার্যক্রমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি Central Asian Flyway কার্যক্রমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বন অধিদপ্তর হতে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা-কে উক্ত Flyway এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Sites in Bangladesh

East Asian-Australasian Flyway Partnership ৬ নভেম্বর ২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। EAAFP এর সদর দপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত। EAAFP এর বর্তমানে ৩৭ টি Partners রয়েছে; তন্মধ্যে ১৮ টি দেশ, ৬ টি Intergovernmental agencies, ১২ টি International NGOs এবং ১ টি International private enterprise অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ Flyway Partnership-এর উদ্দেশ্য হলো সরকার, সাইট ম্যানেজার, বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, শিল্প ও সকল স্তরের সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং প্রচারের জন্য একটি ফ্লাইওয়ে বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা এবং পরিযায়ী পাখি এবং এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।

EAAF এর আওতায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব তিমুরসহ ২২ টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, EAAF উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি আন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flayway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গাঙগুইয়ার চর:

গাঙগুইয়ার চরটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব মেঘনা মোহনায় জেগে উঠা একটি চর। এটি এখনো মানব বসতিহীন একটি বিচ্ছিন্ন কাদাচর। এই চরটির পূর্বে হাতিয়া উপজেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ উপজেলা এবং উত্তরে জাহাজের চর অবস্থিত।

২০১৫-১৮ সালের একাধিক জরিপে গাঙগুইয়ার চর ও এর আশেপাশের চরাঞ্চলে প্রতিবছর সর্বমোট ৪২ প্রজাতির গড়ে ২৫,০০০টি পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। এ বিশাল সংখ্যাটি বৈশ্বিক পরিযায়ী পাখিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া এ চরের পার্শ্ববর্তী মেঘনা মোহনা বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ডলফিন প্রজাতি ও ইলিশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নিঝুম দ্বীপ:

নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ, যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর। ১৯৪০ এর দশকে এই দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর হতে জেগে উঠতে শুরু করে। ছিলো চর-ওসমান। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে, এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল। ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-২০,০০০টি পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এ এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরল ও বিপদাপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান *(Calidris pygmaea)* এদের মধ্যে অন্যতম।

সোনাদিয়াঃ

সোনাদিয়া দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে এবং উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীর কুতুবজং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়া কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে প্রায় ২.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সমুদ্র সৈকতে এর দৈর্ঘ্য ১৯.২০ কিলোমিটার। কক্সবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাগরের বুকে সোনাদিয়া দ্বীপটির অবস্থান।

সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ২৭ প্রজাতির পাখির দেখা মিলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এ দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এ পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা-কচ্ছপ।

টাঙ্গুয়ার হাওরঃ

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম জলমহালগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থিত জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের কাছে এ হাওরটি **নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল** নামে পরিচিত। বর্তমানে এ হাওরের মোট জলমহাল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে, হিজল-করচ বন ও নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়; যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। ২০২০ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৩৫ প্রজাতির ৫১,৩৬৮টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন পাখি প্রজাতির মধ্যে বৈকাল-তিলিহাঁস (*Sibirionetta formosa*) এর দেখা মেলে। বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন ' এবং বিশ্বে 'বিপন্ন ' প্রাণী হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঈগলের (*Haliaeetus leucoryphus*) দেখা মেলে এ হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে এবং প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে।

হাকালুকি হাওরঃ

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর; তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%); সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) ও বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে।

প্রায় সারাবছরই বিল গুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিচালিত জলচর পাখি শুমারি অনুযায়ী, ৫৩ প্রজাতির মোট ৪০,১২৬টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন বেয়ারের-ভূতিহাঁস (*Aythya baeri*), সংকটাপন্ন পাতি-ভূতিহাঁস (*Aythya ferina*), প্রায়-সংকটাপন্ন মরচেরং-ভূতিহাঁস (*Netta rufina*) ইত্যাদি পাখি প্রজাতির দেখা মেলে।

হাইল হাওর:

হাইল হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিয়দাংশে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এতে রয়েছে ১৪টি বিল এবং পানি নিষ্কাশনের ১৩টি নালা। এই হাওরটির মোট আয়তন ১০হাজার হেক্টর। বাইক্কা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। ২০১১ সালে নতুন ৪টি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে এ বিলের চারপাশের বনে; সেগুলো হলোঃ বড়ঠুঁটি-নলফুটকি, উদয়ী-নলফুটকি, বৈকাল-ঝাড়ফুটকি ও সাইক্সের-ফুটকি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশমান একটি ধারা হলো প্রকৃতি পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজম। এটি এমন একটি দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থা, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে পর্যটন পরিচালিত হয়। বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে ইকো-ট্যুরিজমকে তাদের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত করেছে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করেছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশেও এই খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়, বনভূমি, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, ম্যানগ্রোভ বন এবং বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল সব মিলিয়ে দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পর্যটকদের কাছে এক অনন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন এবং প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি পর্যটন গন্তব্য। সেন্টমার্টিনে সামুদ্রিক কাছিম, বিচিত্র প্রবাল, কাঁকড়া এবং নানা প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে, যা পর্যটকদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন এবং উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মনোরম পরিবেশও ভ্রমণপিপাসু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথাযথ পরিকল্পনা, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাময় খাতকে জাতীয় অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান

মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমূহ

কেন্দ্রীয় অঞ্চল: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), গাজীপুর সাফারি পার্ক (গাজীপুর), জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান (ঢাকা), বলধাগার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র।

সিলেট অঞ্চল: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর হাওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত।

চট্টগ্রাম অঞ্চল: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোর্পাক, মহামায়া ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এ অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ।

পার্বত্য অঞ্চল: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝর্না, মাথিনের কূপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, যমুনা সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কঁচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ অসংখ্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল।

ইকো-ট্যুরিজমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব

ইকো-ট্যুরিজম শুধু ভ্রমণের আনন্দই দেয় না, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি কার্যকর মাধ্যম। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এটি স্থানীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করে: পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ গাইডিং, পরিবহন, হোমস্টে ও হস্তশিল্প বিক্রির মাধ্যমে আয়ের সুযোগ পায়।

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে: প্রকৃতি সংরক্ষণ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া গেলে স্থানীয় মানুষ সংরক্ষণ কার্যক্রমে আরও আগ্রহী হয়।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে: হোটেল, পরিবহন, খাদ্যসেবা ও গাইডিংসহ বিভিন্ন খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

৪. পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করে: প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার ফলে মানুষ পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

দায়িত্বশীল প্রকৃতি পর্যটনের নির্দেশিকা (করণীয় ও বর্জনীয়):

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি এর সুরক্ষার দায়িত্বও আমাদের। ইকো-ট্যুরিজমের মূল শর্ত হলো প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না করা। পর্যটকদের জন্য নিচে কিছু নিয়মকানুন তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	✓ করণীয় (কী কী কাজ করা উচিত)	✗ বর্জনীয় (কী কী কাজ করা উচিত নয়)
১	ভ্রমণস্থানের নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে চলা এবং প্রবেশ ফি বা পার্কিং ফি থাকলে তা প্রদান করা।	গাছপালা, বনাঞ্চল বা বন্যপ্রাণীর ক্ষতি বা বিরক্তি উৎপাদন হয়- এমন কোনো কাজ না করা (যেমন: বন্যপ্রাণীকে খাবার দেওয়া বা ঢিল ছোঁড়া থেকে বিরত থাকা)।
২	নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা।	প্লাস্টিক, পলিথিন বা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলা।
৩	বনের ভেতর হাঁটার সময় নির্দিষ্ট ট্রেইল বা পথ ব্যবহার করা।	সংরক্ষিত বনাঞ্চল, নদী, সাগর ও জলাশয়ে কোনো ধরনের অপচনশীল বর্জ্য না ফেলা।
৪	প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এবং নিরাপদ থাকতে প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড সাথে রাখা।	বনে উচ্চস্বরে মাইক, স্পিকার বা গাড়ির হর্ন না বাজানো।
৫	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা।	অকারণে হৈচৈ বা চিৎকার-চেঁচামেচি করে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রশান্তি নষ্ট না করা।

জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মূলত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ফলে ঘটছে, যার প্রভাব বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই পড়ছে এবং তা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে দেশের বাস্তুসংস্থান এবং মানুষের জীবনধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে (International Centre for Climate Change and Development, ২০২০)। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ ঝুঁকিতে রয়েছে। ১৯৬১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ৩.৩ মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে (Bangladesh Meteorological Department, ২০১৯)। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যেতে পারে, যার ফলে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে (World Bank, ২০২০)। এছাড়া যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুনমাত্রা; যেমন-জলাবদ্ধতা, মরুময়তা, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি।

বন অধিদপ্তর এসডিজি-২০৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Voluntary National Contributions (VNC) এবং UNCBD সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজনে (Adaptation) উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে বন অধিদপ্তর ১৯৬৫ সালে থেকে বাংলাদেশ উপকূলে জেগে উঠা চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন করে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক সাল পর্যন্ত ২৭৩৭৭৫ হেক্টর বনায়ন করা হয়েছে যা সবুজ বেষ্টনী সৃজনসহ উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করছে। এছাড়া বন অধিদপ্তর

২০০৯-২০১০ সাল হতে ২০২৪-২৫ আর্থিক সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী ১৪৩৯৬৩ হেক্টর ব্লক, ১০২০৫৮ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ৩৪২৯৭ কি.মি স্ট্রিপ বনায়ন সৃজন করেছে। বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানোর জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ভিত্তি করে Forest Reference Emission Level (বনখাতের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা) প্রণয়নপূর্বক ২০১৯ সালে UNFCCC তে দাখিল এবং পরবর্তীতে Nationally Determined Contributions (NDCs) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন বহুমাত্রিক এবং জটিল সমস্যা, যার সমাধান এককভাবে সম্ভব নয় বিধায় এর মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে বাংলাদেশের জনগণের একটি নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়।

বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

দেশের বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, গ্রাম বাংলার দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নসহ বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৪.৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সরকারি বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি বনের বাইরের এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২৫-২৬ আর্থিক সালে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্প (১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২টি সমীক্ষা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে; যার আরএডিপি বরাদ্দ ১৬৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩৭১৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭৫২.০০ লক্ষ টাকা)।

বিনিয়োগ প্রকল্প:

১. ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক,কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৬)

২. কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)

৩. মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫)

৪. সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)

৫. সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৬)

৬. বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম এর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)

৭. গাজীপুর সাফারি পার্ক এর অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনা সহায়ক প্রকল্প (জুলাই, ২০২৪ হতে জুন ২০২৭)

৮. Establishing Green Belt at Bhasan Char and Reforestation in Rhoingya Affected area in Cox's Bazar (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৬)

৯. বাংলাদেশের প্রাণিকুলের রেড লিস্ট হালনাগাদকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭)

১০. হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫ হতে জুন ২০২৮)

১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজায়নের মাধ্যমে বন ও ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫ হতে জুন ২০২৯)

কারিগরি প্রকল্প:

১. USAID Ecosystems/Protibesh Activity প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন ২০২৬)

২. প্রযুক্তি নির্ভর বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৯)

সমীক্ষা প্রকল্প:

১. ফিজিবিলিটি স্টাডি অন দি এসেসমেন্ট অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থ্রু দি ডিজিটালাইজেশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড ডাটাবেজ এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ ই-ইফিসিয়েন্সি (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬)

২. ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এ্যান্ড ইকোট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ইন ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫)

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প:

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন: বাংলাদেশের বনাঞ্চলে বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, রিইন্ট্রোডাকশন ও হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসন প্রকল্প। (এপ্রিল ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত)

২. প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত উপকূলীয় দুর্যোগ প্রশমন (NBS-SW) প্রকল্প। (জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত)

৩. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে মধুপুর শালবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রকল্প। (এপ্রিল ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত)

৪. পূর্বাচল শালবন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।(জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত)

৫. চুনতি বনাঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল বন পুনরুদ্ধার (পুনরুদ্ধার-চুনতি) প্রকল্প। (চুনতি বনাঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল বন পুনরুদ্ধার (পুনরুদ্ধার-চুনতি) প্রকল্প)

৬. হাকালুকি হাওড়ের হাল্লা পাখিবাড়ীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (অক্টোবর ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

বন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

জাতীয় বন জরিপ (২য় পর্যায়)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় বন জরিপ (NFI ২০২৩-২০২৪) সম্পন্ন হয়েছে। টেকসই বন ও জীবিকা (SUFAL) প্রকল্পের সহায়তা এবং FAO-এর কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত এই কার্যক্রমে সমন্বিত Biophysical মাঠ জরিপ, Satellite ভিত্তিক এবং Socio-economic জরিপের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় বন জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭,৮২,৪০৬ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ১২.১%। তবে শুধুমাত্র স্থলভাগ (অর্থাৎ সকল জলাশয় বাদ দিয়ে) বিবেচনা করলে বনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩.৪৪%। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ১,০১,৬১৩ হেক্টর কমেছে (১২.৭৭% থেকে ১২.১%)। এই অবক্ষয় প্রধানত পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক ছিল, যেখানে ১,০৩,৩২০ হেক্টর বনভূমি হ্রাস পেয়েছে। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে বনভূমির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি (৯,৩২৮ হেক্টর) এই ক্ষতির একটি অংশ আংশিকভাবে পূরণ করেছে।

জরিপ অনুযায়ী জাতীয়ভাবে মোট ৩১৯টি বৃক্ষ প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। NFI তে বন ও বনের বাইরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা করার জন্য বাংলাদেশকে ৫টি জোনে ভাগ করা হয়েছে (Hill zone, Sal zone, Sundarbans zone, Coastal zone, Village zone)। Hill zone এ সর্বাধিক প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে (২৩৮টি প্রজাতি), এরপর রয়েছে Village zone (১৯২টি প্রজাতি)। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রামীণ বসতি এলাকায় সর্বোচ্চ সামগ্রিক বৈচিত্র্য দেখা গেছে, যেখানে ১৯৩টি বৃক্ষ প্রজাতি পাওয়া গেছে। এটি বনবহির্ভূত বৃক্ষসম্পদের (Trees Outside Forest-TOF) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করে।

জাতীয় পর্যায়ে Gross Tree Volume দাঁড়িয়েছে ৩৯২.০৪ মিলিয়ন ঘনমিটার (m^3)। প্রধান প্রজাতিগুলোর মধ্যে মেহগনি (*S. mahagoni*) সর্বোচ্চ gross tree volume প্রদর্শন করেছে, এরপর রয়েছে সুন্দরবনের দেশীয় প্রজাতি সুন্দরী (*H. fomes*) ও কেওড়া (*S. apetala*)। জাতীয় পর্যায়ে মোট tree volume ৮.১২ মিলিয়ন ঘনমিটার বৃদ্ধি দেখা গেলেও এই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে tree volume উল্লেখযোগ্যভাবে ১০.০৪ মিলিয়ন ঘনমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।

Biomass এর ক্ষেত্রে, জাতীয় পর্যায়ে সব উৎস মিলিয়ে Aboveground Biomass (AGB) দাঁড়িয়েছে ৩৩৬.৭৬ মিলিয়ন টন, যা হেক্টর প্রতি পরিমাণ ২৫.১৮ টন। বাংলাদেশের বনাঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১২৬.৪৯ মিলিয়ন টন, যা হেক্টর প্রতি পরিমাণ ৬৮.৬৯ টন। সুন্দরবনে সর্বোচ্চ AGB ঘনত্ব (১১০.১৯ টন প্রতি হেক্টর) পাওয়া গেছে। তবে মোট AGB-এর সবচেয়ে বড় অবদান এসেছে Village zone থেকে, যার পরিমাণ ১৮৫.৪৩ মিলিয়ন টন।

পাঁচটি কার্বন পুলের মোট কার্বন মজুদের হিসাবে দেখা যায় যে, বনবহির্ভূত ভূমি বা Trees Outside Forest জাতীয় মোট কার্বন মজুদের ক্ষেত্রে বনাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি অবদান রাখে। বনবহির্ভূত এলাকায় মোট কার্বন মজুদ ৯৭৩.২৮ মিলিয়ন টন, যেখানে বনাঞ্চলে তা ২৭১.৩৩ মিলিয়ন টন। এটি দেশের কার্বন ভারসাম্যে বনবহির্ভূত বৃক্ষসম্পদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করে। এছাড়া সুন্দরবনে মোট কার্বন মজুদ ৭০.৭ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সালে ৪.০৩ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র

SPOT (Resolution 6 meter) স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে ২০২৩ সালের বাংলাদেশের ভূমি আচ্ছাদন/ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র (land cover/ land use) তৈরি করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে।

২০২৩ এর ভূমি আচ্ছাদন/ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়ায়, ২০২৩ সালের SPOT স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ২০১৫ সালের SPOT স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে তৈরিকৃত ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণিগুলোকে (৩৩ টি শ্রেণি) স্থাপন করে অন-স্ক্রিন ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সকল শ্রেণিগুলোকে হালনাগাদ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, প্রতিটি জেলার নদী ও খালগুলোকে পৃথকভাবে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে তারপর অন্যান্য শ্রেণিগুলোর হালনাগাদ করা হয়েছে। সময়ানুক্রমিক সেন্টিনেল-২ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে সকল জেলার একফসলি জমি (single crop) ও বহুফসলি জমি (multiple crop) শনাক্ত করা হয়েছে। ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণি চূড়ান্ত করার জন্য SPOT ইমেজের পাশাপাশি ওয়ার্ল্ডভিউ (০.৩ মি) ইমেজ, উচ্চ রেজোলিউশনের গুগল আর্থ এবং সেন্টিনেল-২ ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের যাচাইকরণ, বৈধতা যাচাই, নির্ভুলতা মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০১৫ এবং ২০২৩ এর ভূমি আচ্ছাদন/ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র একই ধরনের স্যাটেলাইট ইমেজ এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করায় নির্ভরযোগ্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে, যা বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভূমি আচ্ছাদন এলাকা ২০২৩

ক্রম	ভূমি আচ্ছাদন শ্রেনির নাম	এলাকা (হেঃ)
১	বিমান বন্দর (Air Port)	২,৬৮১.০০
২	বাঁশবন (Bamboo Forest)	১,৪৫,৫৪৬.৩৩
৩	বাঁওড় (Baor)	১৯,০২৩.৮৪
৪	লবণাক্ত পানির ঘের (Brackish Water Aquaculture)	১,৫২,২০১.৮৭
৫	ইটভাটা (Brickfield)	৩৩,১৪৩.২৯
৬	নির্মিত ও নির্মানাধীন এলাকা (Built-Up Non-Linear)	২,২০,৫৮২.৮৬
৭	ভাগাড়/উত্তোলন স্থান (Dump Sites/ Extraction Sites)	৯,৭৫২.৫৫
৮	রোপিত/সৃজিত বন (Forest Plantation)	৯৯,৭৯১.৬০
৯	মিঠাপানির ঘের (Fresh Water Aquaculture)	২,৮৪,৩২৩.৬১
১০	ঘাস অধ্যুষিত এলাকা (Herb Dominated Area)	১,০০,০৬৯.৩১
১১	পাহাড়ি বন (Hill Forest)	৫,৩১,৮৮৮.০৫
১২	হ্রদ (Lake)	৬০,৭০৪.৬৫
১৩	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove Forest)	৩,৯৩,৭৭৩.৫৯
১৪	ম্যানগ্রোভ বনায়ন (Mangrove Plantation)	৬৬,২৯২.৬৮
১৫	কাদাচর বা আন্তঃজোয়ার এলাকা (Mud Flats or Intertidal Area)	১,২৫,০২৩.১৯
১৬	বহুফসলি জমি (Multiple Crop)	৪৫,০৩,০৫২.১৭
১৭	চাবাগান ও অন্যান্য বাগান (গুল্ম) Orchards and Other Plantations (Shrub)	৭৬,০৭৫.৩৬
১৮	ফলের বাগান ও অন্যান্য বাগান (গাছ) Orchards and Other Plantations (Trees)	২,৮৫,৫৬০.৯১
১৯	হাওর/বিল (Perennial Beels/Haors)	৬৮,৪৭৯.৫৪
২০	শাল বন (Plain Land Forest (Sal Forest)	২০,৮৪২.৬১
২১	পুকুর (Ponds)	২৪,২৮৮.৪০
২২	নদীর তীর (River Banks)	৫৭৭.৫৩
২৩	নদী ও খাল (Rivers and Khals)	১৩,২১৫৯২.৫৩
২৪	রাবার বাগান Rubber Plantation	৩৩,৩৪৫.৪২
২৫	গ্রামীন বসতি (Rural Settlement)	৩১,৩৯৭২৬.৪৭
২৬	লবণ চাষ এলাকা (Salt Pans)	৩৮,৬৯৮.৬৪
২৭	বালি বা বালুময় এলাকা (Sand)	১,০৯,৩৪৮.৩২
২৮	জুম চাষ (Shifting Cultivation)	৩৩,৬৬৫.৮৫
২৯	বিক্ষিপ্ত গাছপালাসহ গুল্ম (Shrubs with scattered trees)	৪,৮৯,৮৫১.৫৯
৩০	একফসলি জমি (Single Crop)	২৩,৫০,৪৭৯.৭৭
৩১	জলাভূমির বন (Swamp Forest)	১৩৭.২৪
৩২	জলাভূমি বনায়ন (Swamp Plantation)	৯৩৬.৫৩
৩৩	নলখাগড়া-আচ্ছাদিত জলাভূমি (Swamp Reed Land)	১৫,৫৪২.৭০
	মোট	১,৪৭,৫৭,০০০.০০

বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা/পুনরুদ্ধার

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে মধুপুর শাল বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে বনের শ্রেনিবিন্যাসে টাঙ্গাইল বন বিভাগের শালবনকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র পত্রঝরা (Tropical Moist Deciduous Forest) বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টাঙ্গাইল বন বিভাগের মধুপুরের গড় দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী শাল বা গজারী বন হিসেবে পরিচিত। ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ও ১৯ জুলাই ১৯৮৪ সাল এবং সংরক্ষিত বনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মধুপুরের ৪৫,৫৬৫.১৮ একর বনভূমিতে শালবন বিস্তৃত ছিল। ১৯৮২ সালে ২০,৮৩৭.২৩ একর বনভূমিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গাইল বন বিভাগের মধুপুর জাতীয় উদ্যান সদর রেঞ্জ, দোখলা রেঞ্জ, অরণখোলা রেঞ্জ ও মধুপুর রেঞ্জ এ চারটি রেঞ্জ নিয়ে মধুপুরের শালবন গঠিত। অরণখোলা, বেরিবাইদ, চুনিয়া, গাছাবাড়ি, ইদিলপুর, রামকৃষ্ণবাড়ি, পিরোজপুর, মহিষমারা, আউশনারা, বেতবাড়ি, জয়নাতলী, ইলিদিয়া, শোলাকুড়ি, জোরামগাছা ও ফুলবাগচালা এই ১৫টি মৌজার ৪৫,৫৬৫.১৮ একর বনভূমির সীমানা চিহ্নিত না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বনভূমি জবরদখল করে বসতভিটা তৈরী, আনারস, কলা ও পেঁপে চাষ করায় মধুপুরের বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি: তারিখ হতে টাঙ্গাইল বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল এর যৌথ উদ্যোগে মধুপুর বনের সীমানা চিহ্নিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মধুপুর বনাঞ্চলে গৃহজরিপ ২০২৫ অনুযায়ী গারো ১৯,৫২৬ জন, কুচ ও বর্মণ ৩৭৯৮ জন এবং স্থানীয় বাঙ্গালি ৭৭,৬২৪ জনসহ মোট ১,০০,৯৪৮ জন বসবাস করে।

আগামী তিন বছরে (২০২৫-২০২৮) বৈজ্ঞানিক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে মধুপুরে শালবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬৬,১০,৯৫০ টি শাল ও শাল সহযোগী চারা রোপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তিনবছর মেয়াদি "স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে মধুপুর শালবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা" প্রকল্পের মাধ্যমে ১১১১.৫০ একর শাল বন সৃজন করার উদ্দেশ্যে শাল ও শাল সহযোগী প্রজাতির চারা উত্তোলন করা হয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে মধুপুর বনে প্রাকৃতিক শালবন সংরক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ১৯,৯৪১.৯৮ একর বনভূমিতে শাল বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

মধুপুর বনাঞ্চলে সীমানা পিলার স্থাপন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রায়হান কাওছার কর্তৃক মধুপুরে উত্তোলিত নার্সারি পরিদর্শন।

চুনতি বনাঞ্চলের জলবায়ু সহনশীল বন পুনরুদ্ধার (চুনতি-পুনরুদ্ধার)

চুনতি বনাঞ্চলটি প্রায় ৩৭,১৮২.৪১ একর বনভূমি নিয়ে বিস্তৃত; যা চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া, বাঁশখালী, সাতকানিয়া এবং কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও চকরিয়া উপজেলায় বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ বনভূমির প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে ২ টি বন বিভাগ।

১। **চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ:** চুনতি রেঞ্জের অধিক্ষেত্রাধীন ০৪ টি বিটে (সাতগড়, বড়হাতিয়া, হারবাং, বরইতলী বিট) ৯ টি মৌজায় মোট ১২৭০২ একর বনভূমি।

২। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রাম: চুনতি ও জলদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রেঞ্জের অধিক্ষেত্রাধীন ০৭ টি বিটে (চুনতি, আজিজনগর, হারবাং, পুইঁছড়ি, নাপোড়া, চাম্বল, ও জলদী বিট) ১৪ টি মৌজায় মোট ২৪,৪৮০.০৫ একর বনভূমি রয়েছে। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রামের আওতাধীন উক্ত ২৪,৪৮০.০৫ একর বনভূমির অভ্যন্তরে ১৯,১৭৭.০০ একর বনভূমি নিয়ে ১৯৮৬ সালে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষিত হয়।

চুনতি বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্য:

১। জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন।

২। চুনতি বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা বৃদ্ধি।

৩। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

৪। স্থানীয় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন।

৫। শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বন অধিদপ্তরের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার তথ্যাদি

- বাংলাদেশ ফরেস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (BFIS) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের ওয়েব বেইজড সকল সিস্টেমকে একটি সাইটে যুক্তকরণ;
- সার্ভিস রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসআরএমএস) এর মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- নার্সারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএমএস) এর মাধ্যমে চারা উত্তোলন ও বিক্রয়/বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ;
- বাগান সৃজনের সাইট স্পেসিফিক প্লানিং (এসএসপি) প্রবর্তন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ও পরিচালনা;
- সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজম স্পটসমূহ ভ্রমণে ই-টিকেটিং চালুকরণ;
- মাইগভ প্ল্যাটফরর্মের মাধ্যমে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা ও বলধা গার্ডেনে দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকেটিং বাস্তবায়ন;
- পাহাড় ব্যবস্থাপনার তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং অনুসন্ধানের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম "পাহাড়ের বিস্তৃত মানচিত্রায়ন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা" (CHMMS) প্রস্তুতকরণ;
- বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য "সর্প দংশনে সচেতনতা" অ্যাপ প্রস্তুত;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপি ব্রিজ নির্মাণ;
- বন অধিদপ্তরের লাইব্রেরি ও স্টোর ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব বেইজড "ই-লাইব্রেরি" ও "ই-স্টোর" সিস্টেম প্রবর্তন;
- বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ;
- সাইটিস কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সাইটিস বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে সাইটিস এপেন্ডিক্সভুক্ত পাখি আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার উদ্দেশ্যে CITES Permit/Certificate and NOC System শীর্ষক একটি Web application তৈরি করা হয়েছে।

ডি-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ২০১৭ সাল থেকে ডি-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ ডি-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে এ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বন অধিদপ্তর ও আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে কর্মরত জনবলকে ডি-নথিতে ই-ফাইলিং পরিচালনায় যুক্ত করা হচ্ছে এবং মোট নিষ্পত্তিকৃত নোটের উল্লেখযোগ্য অংশ ডি-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে।

মাইগভ (MyGov)

এক ঠিকানায় সকল সরকারি সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত মাইগভ প্ল্যাটফরর্মের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বন অধিদপ্তরের ১২ টি নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের সহজ ও হয়রানিমুক্ত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মাইগভ সিস্টেম হতে প্রদত্ত বন অধিদপ্তরের অনলাইন সেবাসমূহ:

১। সরকারি বনে গবেষণা কাজের অনুমতি প্রদান;
২। সুন্দরবন ও অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় শুটিং এর অনুমতি প্রদান;
৩। জীবিত ও হিমায়িত কাঁকড়া রপ্তানির জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদান;
৪। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গবেষণার অনুমতি প্রদান;
৫। গাছের চারা রপ্তানির অনাপত্তি (NOC) প্রদানের আবেদন;
৬। হরিণ লালন-পালন খামারির জন্য লাইসেন্সের আবেদন;
৭। হরিণ খামারের জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পজেশন সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদন;
৮। হরিণের পজেশন সার্টফিকেটের জন্য আবেদন;
৯। কুমির লালন পালন খামারের জন্য লাইসেন্সের আবেদন;
১০। কুমির খামারীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন;
১১। কুমিরের পজেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন;
১২। গবেষণার কাজে CITES Appendix বহির্ভূত বন্যপ্রাণীর নমুনা বিদেশে প্রেরণ বা নমুনা বিদেশ থেকে নিয়ে আসা সংক্রান্ত;

স্মার্ট টহল (SMART-Spatial Monitoring and Reporting Tool)

বন ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা জোরদারকরণ, বন্যপ্রাণীর উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা হটস্পটসমূহ সনাক্তকরণ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতান্ত্রিক প্রবণতা নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন সংক্রান্ত অপরাধ দমন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং টহলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে 'স্মার্ট মোবাইল' অ্যাপের মাধ্যমে টহল টিম টহল পরিচালনার সময় পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে 'স্মার্ট ডেস্কটপ' সফটওয়্যারের সাহায্যে ডেটা ক্লিনিং করার পর 'স্মার্ট কানেক্ট' সার্ভারে প্রেরণ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয় থেকে টহল সংক্রান্ত ডেটা মনিটরিং করা হয়। বর্তমানে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যসহ মোট ১১টি সংরক্ষিত এলাকায় স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে:

১। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার

২। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার।

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার:

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'বৃক্ষরোপণ' কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি টেকসই স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নব্বই দশক হতে বৃক্ষরোপণে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদেরকে "বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়ে থাকে।

"বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার" কে আরো প্রতিযোগিতামূলক, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত নীতিমালাটি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধন করে ১৬টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে নীতিমালাটি পুনঃ সংশোধন পূর্বক ১৬টি শ্রেণির পরিবর্তে ১০টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে "বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)- ২০২৫" প্রণয়ন পূর্বক ১০টি শ্রেণির পরিবর্তে ০৭টি শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদানসহ পুরস্কারের অর্থ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, প্রথম পুরস্কার- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়।

শ্রেণীসমূহ:

ক. প্রাথমিক বিদ্যালয়/ উচ্চ বিদ্যালয়/ এবতেদায়ী মাদ্রাসা/ সিনিয়র মাদ্রাসা/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়।

খ. ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজিলা পরিষদ/ জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সেক্টর/ কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/ ক্লাব/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

গ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ।

ঘ. ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারি।

ঙ. ব্যক্তিগত/ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সৃজিত ছাদ বাগান।

চ. বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান।

ছ. বৃক্ষ সম্পর্কিত গবেষণা/ সংরক্ষণ/ উদ্ভাবন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার:

"বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা এবং গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমকে জাতীয়ভাবে উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান করা"-এতদউদ্দেশ্যে ২০২৫ সালে "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৫" নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচটি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ইউনিট/বিভাগকে ২২ ক্যারেটের ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণপদক ও ১,০০,০০০ (এক) লক্ষ টাকার অ্যাকাউন্ট পে-ই চেক এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে।

ক্যাটগরিসমূহঃ

ক্যাটাগরি (ক). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (ব্যক্তি পর্যায়)

ক্যাটাগরি (খ). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (প্রতিষ্ঠান/সংগঠন পর্যায়)

ক্যাটাগরি (গ). বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা (ব্যক্তি পর্যায়)

ক্যাটাগরি (ঘ). বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা (প্রতিষ্ঠান পর্যায়)

ক্যাটাগরি (ঙ). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী/ইউনিট/বিভাগ পর্যায়)

উল্লেখ্য, জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে শুরু করে এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। যথাঃ

i) UN declared Equitor Award 2012
ii) Wangiri Mathai Award 2012
iii) JSW Earth Care Award 2012
iv) Solution Search 2013
v) HSBC-Daily Star Climate Award
vi) Champion of the Earth 2015

বন অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বন বিভাগে পালনকৃত সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হলোঃ

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসঃ

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ২০২৬ সালের ১১ মার্চ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল আউয়াল মিন্টু এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ ফরিদুল ইসলাম এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এবং প্রাক্তন কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইইউসিএন, বাংলাদেশ এবং জনাব বিপাশা এস হোসেন, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইইউসিএন, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। বন্যপ্রাণী দিবসের ২০২৬ এর বাংলা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় **"ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, ঐতিহ্য ও জীবিকার উন্নয়ন"**।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৬

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস

১. বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস: ১ ফেব্রুয়ারি।
২. বিশ্ব জলাভূমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারি।
৩. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৪. বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ।
৫. বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস: ১৮ এপ্রিল।
৬. ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল।
৭. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৮. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৯. বিশ্ব সমুদ্র দিবস: ৮ জুন।
১০. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১১. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১২. আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস: সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার।
১৩. আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস: ১৬ সেপ্টেম্বর।
১৪. বিশ্ব নদী দিবস: সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার।
১৫. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস: ৪ ডিসেম্বর।
১৬. বিশ বন্যপ্রাণী দিবস: ৩ মার্চ।
১৭. বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস: ১০ অক্টোবর।
১৮. আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস: ২৪ অক্টোবর।
১৯. আন্তর্জাতিক কাছিম দিবস: ২৩ মে।
২০. বিশ্ব ব্যাঙ দিবস: ২০ মার্চ।

বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ৩১%।
২. পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা।
৩. রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরু এবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন আছে।
৪. কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, সান ম্যারিনো, সেইন্ট ব্যথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জেন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই।
৫. প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে।
৬. প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।
৭. পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে।
৮. পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে।
৯. পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশি Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয়।
১০. পৃথিবীর মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেস্টেশন এবং ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয়।
১১. পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে।

তথ্যসূত্র: FAO, UN-REDD, UNDP, UNEP & IUCN website

বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য

- পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী বিদেশি কেইজবার্ড (যেমন: বাজরিগার, লাভবার্ড, ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে-প্যারট ইত্যাদি) প্রজাতির পাখি সৌখিনভাবে যে কেউ বাসায় পালতে পারেন। তবে, দেশীয় বা পরিযায়ী প্রজাতির কোনো বন্যপ্রাণী বাসায় পোষা আইন পরিপন্থি।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬-এর তফসিলভুক্ত যেকোনো বন্যপ্রাণী, তার ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি দখলে রাখা, ক্রয়-বিক্রয় করা, পরিবহন করা কিংবা উক্ত প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ অনুযায়ী যথাযথ লাইসেন্স বা পারমিট ছাড়া তফসিলভুক্ত কোনো বন্যপ্রাণী শিকার, লালন-পালন, আবদ্ধ অবস্থায় রাখা, দখলে রাখা, ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের কার্যকলাপ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।"
- বন সংরক্ষকের কার্যালয়, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা থেকে বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করা যায়। এছাড়াও, চিত্রা হরিণ এবং বিদেশি পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং বিদেশি পোষা পাখি আমদানির জন্য অনাপত্তিপত্র (No Objection Certificate) ইস্যু করা হয়ে থাকে।
- হাতি দ্বারা রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজার বা দোকান ইত্যাদি স্থানে চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ ঘটনা দেখামাত্র নিকটস্থ প্রশাসন অথবা থানায় অবহিত করুন।
- বন্যপ্রাণীর প্রতি কোনো ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ যেমন: প্রহার করা, উত্ত্যক্ত করা, চোখ বেঁধে রাখা, অপ্রয়োজনে আটকে রাখা, ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, পরিবহনের সময় কষ্ট দেওয়া, অতিরিক্ত ভার বহন করানো, বৈদ্যুতিক তারের বেড়া ব্যবহার করে হত্যা করা বা এ ধরনের নিষ্ঠুর আচরণের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা যাবে না। এসব কর্মকাণ্ড আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, হাট-বাজার বা অন্য কোনো মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ক্রয় বা বিক্রয়, বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার কিংবা কেনাবেচার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা যাবে না। এ ধরনের কার্যকলাপ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বন অধিদপ্তরের বিগত ০৩ (তিন) বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বনভূমিতে বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় সর্বমোট ৩০,৯১৩ হেক্টর ব্লক, ২১,৬৫৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ৫,৭৪৬ সিডলিং কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণের ৭৮.৪৪ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।
- বনভূমির ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বনভূমির দখল প্রতিরোধ, বন ও বনভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, বনভূমির পরিমাণ হ্রাস রোধকল্পে এবং শতবর্ষী বৃক্ষ-সহ জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংরক্ষিত বৃক্ষ ঘোষণার মাধ্যমে বৃক্ষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অতিসম্প্রতি 'বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়।
- বিপদাপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এবং IUCN এর কারিগরি সহায়তায় ১,০০০ টি উদ্ভিদ মূল্যায়নপূর্বক রেড লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে।
- ০৫টি রক্ষিত এলাকায় বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি (Invasive Alien Species) নিয়ন্ত্রণের জন্য Invasive Alien Species নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বন ও বনজ সম্পদের তথ্যাদি হালনাগাদকরণে বন জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সামাজিক বনায়নসহ দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২৪.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ২৩ হাজার ৬৬০ জন উপকারভোগীর মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে ৯৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৪৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০২২-২০২৩ হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ০৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০১টি ইকোপার্ক, ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫৭টি।
- সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ১২৫টি।
- ক্যাপটিভ হাতি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গাজীপুর সাফারি পার্কে ০৪ টি হাতির কানে microchip বসানো হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ), আনোয়ারা ও কর্ণফুলী সন্নিহিত এলাকায় হাতির সুরক্ষা এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে (i) মানুষ হাতির প্রতি বিরূপ আচরণ করে হাতিকে ক্ষিপ্ত করতে না পারে এবং মানুষ হাতির সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে KEPZ এর ৬০ জন নৈশ প্রহরীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরও অধিক সংখ্যক নৈশ প্রহরীকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। (ii) ৫টি ERT (Elephant Response Team) এর মোট ৫০ জন সদস্যকে সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইটিস এপেন্ডিক্সভুক্ত সামুদ্রিক প্রজাতিসমূহের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Framework Protocols and Guidelines for trade control for CITES-listed specimens in particular marine species প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখায় ৫টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী আগস্ট, ২০২৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে ১৬১৪ জনকে মোট ৬ কোটি ২০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।
- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে এবং সারাদেশে যেখানেই মানুষ-মেছোবিড়াল দ্বন্দ্বের মাধ্যমে মেছোবিড়াল আহত/হত্যা হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক এবং উদ্ভিদ উদ্যানে প্লাস্টিক ব্যবহার এবং সকল ধরণের বনভোজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পূর্বাচলের ১৪৪ একর জায়গা বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রকাশকাল : জুন ২০২৬ খ্রিঃ।
সম্পাদনা : তথ্যকণিকা ও সাইটেশন প্রকাশনা উপকমিটি-২০২৬, বন অধিদপ্তর।

বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ

বন অধিদপ্তর

বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০০৭১৪২

ইমেইল: ccf-fd@bforest.gov.bd

ওয়েব: www.bforest.gov.bd